বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

প্রিয়দারঞ্জন রায়

B.
891.444
R 13 V

B
891.444
R13V

INDIAN INSTITUTE OF
ADVANCED STUDY
SIMLA

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

প্রিয়দারঞ্জন রায়

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

রত্নসাগর গ্রন্থমালা—১৪

প্রথম প্রকাশ

১৫ই জৈষ্ঠ্য, ১৩৬৪

প্রকাশক

দেবকুমার বসু

৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯

চিত্রকর্ম

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি

চারু খাঁ

মুদ্রক

শ্রীগৌরচন্দ্র পাল

নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস

২।১ কর্ণওয়ালিস্, কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ডি. সি. বোস এণ্ড কোং

৬৫ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্

পরিবেশক

গ্রন্থজগৎ

৬, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—দুইটাকা—

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
মনোজ ভট্টাচার্য
দেবকুমার বসু

নিবেদন

গত নয় দশ বৎসরে লেখকের যে সব প্রবন্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দেশ, উজ্জ্বল ভারত পত্রিকায় ও অন্যত্র ছাপা হয়েছিল, তা হতে বাছনি করে কয়েকটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট ও সংস্কৃতিমূলক বলে পুস্তকের নাম করা হয়েছে **বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি**। বিজ্ঞানে যাঁদের অনুরাগ এবং কৃষ্টিতে যাঁদের প্রয়াস, এরূপ পাঠক-পাঠিকাদের কেউ কেউ যে এতে চিত্তবিনোদনের উপকরণ কিংবা তাঁদের চিন্তাধারায় নূতন প্রেরণা পেতে পারেন, ইহা আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না। পুস্তকখানি প্রকাশের এতেই হবে সার্থকতা।

৫০।১ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা। লেখক

৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৩।

বন্ধুবর শ্রীবিমানবিহারী দে

প্রীতিভাজনেষু—

সূচী :

বিজ্ঞানের সীমানা ৫
বিজ্ঞানের খুঁটি ৯
বিজ্ঞান ও সভ্যতা ২০
বৈজ্ঞানিক সত্য ৩৪
বিজ্ঞানের বিভীষিকা—পরমাণু বোমা ৩৯
বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি ৪৫
বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম্ম ৫৩

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

Library IIAS, Shimla
B 891.444 R 13 V
00009494

INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY
Acc. No. 9494
Date. 5-5-66
SIMLA

B
891.44
R13V

বিজ্ঞানের সীমানা

বিজ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞান। যা চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, নাকে গন্ধ পাওয়া যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, বা জিহ্বায় আস্বাদ করা যায়, তা নিয়েই চলে বিজ্ঞানে জ্ঞানের আহরণ। এ ভাবে বস্তু ও শক্তির সমবায়ে গঠিত যে বিশ্বজগৎ তার খবর আমরা পাই। যা আবার আমাদের নগ্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে আসে না, বিজ্ঞানের কলকৌশলে তাকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমার মধ্যে এনে আয়ত্ত করি; যা শুধু চোখে দেখা যায় না অতি ছোট বলে, বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে আমরা দেখি বড় করে। যা আমাদের দৃষ্টির সীমার বাইরে, তাকেও দেখতে পাই দূরবীণ দিয়ে। কিন্তু পরিণামে সকল দেখাই হচ্ছে চোখ দিয়ে। আমরা আলো দেখি শুধু সাত রকমের; লাল হতে আরম্ভ করে পীত, নারঙ্গ, হরিৎ, নীল, ঘননীল, এবং বেগুনি রং-এর। কিন্তু এ ছাড়াও যে আরো বহু রকমের আলোক-রশ্মি আছে, তাদেরও খবর আমরা পাই বিজ্ঞানের কৌশলে ছবি তুলে। বেগুনি রংএর অতীত বা লাল রং-এর ইতর আলোক-রশ্মিগুলিকে বিশিষ্ট আলোক-চিত্রে পরিণত করে তাদের আমরা আমাদের দৃষ্টির সীমানার মধ্যে নিয়ে আসি। আসল কথা, আলোক, তাড়িত, তাপ ইত্যাদি যাদের শক্তি বলা হয়, তাদের সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আসে একমাত্র বস্তুর সাহায্যে বা বস্তুর সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে। অন্য দিকে শক্তির সাহচর্য্য ব্যতিরেকে বস্তুর অস্তিত্বও আমরা জানতে পারি না; আলোর অভাবে অন্ধকারে কোন জিনিষ আমরা দেখতে পাই না; অবশ্য হাতে স্পর্শ করে তাদের অবস্থিতি বা আকারের কতকটা ধারণা করতে পারি। কিন্তু এতেও রয়েছে শক্তির ক্রিয়া। বস্তুর অণু-পরমাণুগুলি ছুটোছুটি করে আমাদের ত্বক বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর অনবরত ধাক্কা

রত্ন ১৪—১

দেয় বলেই তাদের অস্তিত্বের অনুভূতি আমরা পাই। বাতাস পদার্থটিকে চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না, রসনায় আস্বাদ করা বা নাকে শোঁকা যায় না; কিন্তু ঝড়ে যখন গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে উৎপাতের সৃষ্টি করে তখন তার অস্তিত্বে কোন সন্দেহ থাকে না। বস্তুর সাহায্যে শক্তিকে আবদ্ধ করে এবং শক্তির সাহায্যে বস্তুকে বেঁধে আমরা তাদের হাজির করি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে। এ ভাবেই হয় আমাদের বস্তু ও শক্তিসমন্বিত এই বিশ্বজগতের অনুভূতি। এ সব অনুভূতিগুলিকে অগ্রপশ্চাৎ কার্য্যকারণসূত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আমরা সাজিয়ে নেই আমাদের মনের মধ্যে। তা হতে সিদ্ধান্ত করে যে-জ্ঞান আমরা অর্জ্জন করি, তাকেই বলা হয়, বিজ্ঞানের জ্ঞান। এই হল বস্তুজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সনাতন ও প্রাকৃতিক পন্থা। জন্মাবার পর হতেই মানবশিশু এ ভাবেই করে জ্ঞানের আহরণ বা বিষয়বস্তুর অনুভূতি। বিজ্ঞান শুধু এই স্বাভাবিক পন্থাকেই তার যন্ত্রকৌশলে সমুন্নত করেছে, যার ফলে মানুষের অনুভূতি ও জ্ঞানের সীমা গেছে অপরিমিতভাবে বেড়ে। যা কিছু আমরা কোন উপায়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে আনতে পারি না, তা হয় বিজ্ঞানের অনুমান বা কল্পনা। এখানেই হচ্ছে বিজ্ঞানের একপ্রকার সীমানা। অবশ্য এ কথাও মানতে হবে যে, যা এক সময়ে কল্পনা বলে মানুষ মনে করেছে, বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত যন্ত্রকৌশলে পরবর্ত্তী কালে তা হয়েছে বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য। এর বহু দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। অতএব বলতে হয়, বিজ্ঞানের সীমানা যাচ্ছে ক্রমশঃ বেড়ে। আজ যা আজগুবি বা অসম্ভব, কাল হবে তা জাজ্জ্বল্যমান সত্য। তা বলে কি বিজ্ঞানে জ্ঞানের সীমানা নির্দেশ সম্ভব নয়? এ প্রশ্নের উত্তর বলতে হয়, বস্তু ও শক্তির প্রকাশ-ধর্ম্মের মধ্যেই রয়েছে বিজ্ঞানের সীমানা। এ কারণে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে অনেকে বলেন অপরা জ্ঞান। বিজ্ঞানে জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে কার্য্যকারণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এবং প্রকৃতির রাজ্যে বস্তুজগতে নিয়মের বা আইন-কানুনের অলঙ্ঘনীয় বাঁধন। কিন্তু এ কার্য্যকারণের সম্বন্ধের মধ্যে বিজ্ঞান কোন আদি অন্ত খুঁজে পায় না। যা কিছু আছে

বা যা কিছু ঘটছে, এ সবার আদিম কারণ বা শেষ কি এবং কোথায়, এর কোন উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বস্তু এবং শক্তি আপাত-ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলে দেখা গেলেও আসলে এরা অভিন্ন,—একই সত্তার এ-পিঠ ও-পিঠ রূপে। তাই অবস্থা বিশেষে তাদের বিনিময় ঘটে। কিন্তু বস্তুরূপী শক্তির বা শক্তিরূপী বস্তুর উদ্ভব কোথা হতে, এর উত্তরে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নীরব। কার্য্যকারণবাদী, ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে নির্ভরশীল বিজ্ঞানে এর উত্তর মিলতে পারে না। এখানেই বিজ্ঞান মানে হার।

মানুষের কতগুলি অনুভূতি আছে, যাকে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ বলা যায়। সেগুলি উৎপন্ন হয় অনেক ক্ষেত্রে তার বিচারবুদ্ধি হতে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য, সদসৎ, সুন্দর-অসুন্দর ইত্যাদি। কতগুলি অনুভূতি আছে যাকে আমরা বলি সহজাত বা instinct; যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ, কাম, ক্রোধ, মান, অপমান, অহমিকা ইত্যাদি ; এরা ক্ষুৎপিপাসার অনুভূতির মত অনেকটা শরীর-ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। আবার কতগুলি অনুভূতি আছে যাদের বলা যায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত বা intuitive ; যাদের উৎপত্তি কোথায় কি-ভাবে ঘটে, বলা কঠিন—যেমন ঈশ্বর বা কোন বিশিষ্ট শক্তির অকস্মাৎ অনুভূতি, কোন দুরূহ সমস্যার হঠাৎ বা অকারণ সমাধানের অবগতি। মানুষহিসাবে এ সব অনুভূতির তারতম্য দেখা যায় ; কোথাও প্রবল আবার কোথাও দুর্ব্বল। এ সব ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি বা সত্তা মানবজীবনের মূলে দেয় প্রেরণা , এরা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিতে বা বিজ্ঞানের সীমায় বড় ধরা পড়ে না। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি বা ধর্ম্ম-বৃত্তির বিকাশ হয় এ সব অনুভূতিতে বা জ্ঞানে। এবং মানুষের বিষয়-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে বিজ্ঞানে। তথাপি বিজ্ঞানচর্চ্চা যে মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধিবিকাশেরও অনুকূল হতে পারে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে মানুষ খবর পেয়েছে অনন্ত বিশ্বের এবং অনন্ত কালের, যার তুলনায় মানুষের ক্ষুদ্র পৃথিবী এবং তার স্বল্প জীবনকাল সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত নগন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় কোটি কোটি শশী-ভাস্কর-গ্রহ-তারা-নক্ষত্র-নীহারিকা ও ছায়াপথসমন্বিত

বিশাল বিশ্বজগৎ যা মানুষের কল্পনাকে হার মানায়, আর কোথায় তার তুলনায় বালুকণাসদৃশ বসুন্ধরা যার উপর চলছে মানুষের এত জারিজুরী! এ অনন্ত বিশ্বের সন্ধান দিয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান। কোথায় মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন, আর কোথায় কোটি কোটি যুগ-যুগান্তব্যাপী চলেছে জড় ও জীবজগতের অভিব্যক্তি। জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা এবং জীববিদ্যার চর্চ্চায় মানুষ জানতে পেরেছে এর খবর। ফলে, মানুষের দম্ভ এবং অভিমান যায় ঘুচে। পাঠক হয়ত এখন বলে উঠবেন—তা হলে আজ এ বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-বিরোধ বেড়ে উঠেছে কি কারণে? পৃথিবী জুড়ে যে বিরাট হত্যা-কাণ্ডের অহরহ অভিনয় চলেছে তার মালমশলা আসছে কোথা হতে? এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা সৃষ্টি হল কি করে? এ সব কি বিজ্ঞান চর্চ্চার পরিণাম নয়? এ কথা অস্বীকার করা যায় না, সত্য।

তাই বিজ্ঞানচর্চ্চায় মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্বোধিত না হয়ে, তার স্বার্থবুদ্ধিই শুধু প্রবল হয়ে উঠছে কেন, এটাই হল সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যা বিশেষ জটিল নয়। সহজেই এর সমাধান আমরা পাই। বিজ্ঞানকে আমরা শুধু আমাদের সুখ-সুবিধার কাজে লাগাবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করছি। ফলে, আমরা বিজ্ঞানচর্চ্চা করি খণ্ড-বিখণ্ড ভাবে। অখণ্ড বিজ্ঞানের যে রূপ, তার প্রেরণা হতে আমরা নিজেকে করি বঞ্চিত। তাই আজ দেশে দেশে শিল্পবিজ্ঞানী বা technician-এর সংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে; আসল বিজ্ঞানীর সংখ্যা হচ্ছে বিরল। বিজ্ঞানকে একমাত্র প্রয়োজন ও স্বার্থসিদ্ধির সীমানার মধ্যে কারারুদ্ধ করে রাখলে, তা হতে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশের সম্ভাবনা যায় বিলোপ হয়ে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য, তার ইতিহাস, বিরাট বিশ্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয়, এগুলিকেও করতে হবে বিজ্ঞান চর্চ্চার অঙ্গ। শুধু বস্তুজ্ঞানকে আয়ত্ত করে প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে লাগালে বিজ্ঞান থাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে। এতেই মানুষের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞান হয় এতে বিপথগামী। এ ক্ষুদ্র সীমার অবরোধ হতে বিজ্ঞানকে মুক্ত না করতে পারলে মানুষের নিস্তার নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে,—"নাল্পে সুখমস্তি"। অতএব ভূমার সন্ধানে

পরিচালিত করতে হবে বিজ্ঞানকে, যদি মানুষ হয় মুক্তির প্রয়াসী। একমাত্র প্রয়োগ-বিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে মেতে থাকলেই মানুষের হবে অমঙ্গল। বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডেই মিলবে এ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি ও সার্থকতার সন্ধান। গীতায় বলেছে,

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

তাই বিজ্ঞানের সাধনায় করতে হবে কর্ম্ম এবং জ্ঞানের সমন্বয়।

বিজ্ঞানের খুঁটি

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে ধর্ম্মের চারটি খুঁটি; তাই ধর্ম্মকে চতুষ্পদ বৃষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও তাঁদের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিজ্ঞানেরও তিনটি খুঁটি। এ খুঁটি তিনটির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই হচ্ছে এ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ এ তিনটি খুঁটিকে তিনটি সাঙ্কেতিক অক্ষরে প্রকাশ করে থাকেন, এরা হচ্ছে রোমান বর্ণমালার তিনটি অক্ষর—সি (c), জি (g), ও এইচ (h)। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ যেমন 'ক' বললে কৃষ্ণকে কিম্বা 'হ' বললে হরিকে স্মরণ করতেন, সেরূপ বিজ্ঞানীদের নিকট 'সি' হচ্ছে আলোর গতিবেগ, 'জি' হচ্ছে মহাকর্ষজনিত গতি-বেগের বৃদ্ধিহার এবং 'এইচ' হচ্ছে ক্রিয়ার একক। বিজ্ঞানের গ্রন্থে তাই এদের তিনটি বিশিষ্ট সংখ্যাবাচক অক্ষররূপে গণ্য করা হয়। কারণ, আলোর গতিবেগ, মহাকর্ষজনিত গতিবেগের বৃদ্ধিহার বা ক্রিয়ার একককে সংখ্যার সাহায্যেই আমরা প্রকাশ করে থাকি। এখন এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে পাঠকগণের পরিচয় করে দেবার চেষ্টা করব। প্রায় ২৫০ বছর আগে বিজ্ঞানীরা প্রথম খুঁটি দুটির (সি এবং জি) আবিষ্কার করেন; যদিও আধুনিক যুগের পরীক্ষার ফলে এদের সম্বন্ধে এমন সব নূতন খবর পাওয়া গেছে যাতে তাদের অবয়ব গেছে অনেক বদল হয়ে। বাকী খুঁটিটি (এইচ) হচ্ছে আধুনিক যুগের আবিষ্কার।

১ নং খুঁটি—আলোর গতিবেগ—'সি' (c),

বড় একটি অন্ধকার হল ঘরে রাত্রে প্রবেশ করে বিজলীবাতির চাবিকলে টিপ্ দিয়ে যখন আলো জ্বালা হয়, সঙ্গেসঙ্গেই যে বাতিটি জ্বলে উঠে তা আমরা দেখতে পাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বিজলী-বাতির জ্বলে-ওঠা এবং আমাদের পক্ষে প্রথম আলোর অস্তিত্ব অনুভব করা, এ দু'ঘটনার মধ্যে সময়ের কোন ফাঁক থাকতে পারে কি না? অর্থাৎ বিজলীবাতি হতে আলো বেড়িয়ে আমাদের চোখে এসে পড়তে আদৌ কোন সময়ের দরকার হয় কি না? এরূপ প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করেন প্রথমে ডেনমার্ক-নিবাসী জ্যোতির্বিদ রোমার ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে। বৃহস্পতিগ্রহের কয়েকটি উপগ্রহ আছে। এরা-সব বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, চন্দ্র যেমন আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়। বৃহস্পতির প্রথম উপগ্রহের পরপর গ্রহণ কালের তারতম্য হতে তিনি প্রমাণ করেন যে, আলোর গতিরও একটি নির্দিষ্ট বেগ আছে; এ অসীম বা অপরিমেয় নয়। তবে এ বেগ এত বেশী যে, তা' আমাদের সহজ অনুভূতিতে আসে না। এ বেগের মান হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। অর্থাৎ আলোক তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে চলে। এ বেগের পরিমাণের ধারণা করতে হ'লে একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্তের সাহায্য নিতে হয়। মনে করা যাক, হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্টের উপর একটি প্রকাণ্ড বিজলীবাতি বসান হয়েছে। এ বাতিটি আবার একটি কালো রংএর বাক্সের মধ্যে রাখা আছে। এ বাক্সের এক পার্শ্বে একটি ছিদ্র এবং তার উপর একটি ঢাকনি আছে। অমাবস্যার রাত্রে যদি ঐ বিজলীবাতিটি জ্বালান যায় এবং তার বাক্সের ছিদ্রের উপরের ঢাকনিটি সরান হয়, তবে সে ছিদ্রপথে যে আলো বেরিয়ে আসবে, তাকে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপর বড় বড় আর্শি এবং লেন্স রেখে কৌশলে পুনরায় তার উৎপত্তি স্থানে ফিরিয়ে আনা হয়, তবে দেখা যাবে যে, সমস্ত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসতে তার লাগবে মাত্র এক সেকেণ্ডের ৭ ভাগ কি ৮ ভাগের এক ভাগ সময়। অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে

আলোক-তরঙ্গ যতখানি পথ চলে, তাতে সে ৭ বার কি ৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ জ্যোতির্বিদ ব্রেডলি, ১৮৪৯ এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী ফিজো ও ফুকো এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী মিকেলসন আলো-চলার বেগ নির্ণয় করবার জন্য বিশেষ কৌশল ও সতর্কতা সহকারে নূতন নূতন পরীক্ষার উদ্ভাবন করেন। এর মধ্যে মিকেলসনের পরীক্ষাই সবচেয়ে নির্ভুল এবং নিখুঁত বলে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। ফলে, আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,৩১৭ মাইল হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। যাকে বিজ্ঞানের ১নং খুঁটি বা "সি" বলা হয়েছে তার মান হচ্ছে সুতরাং ১৮৬,৩১৭ মাইল। পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন, বিজ্ঞানে আলোর বেগ নির্দেশক "সি" মার্কা এ সংখ্যাটির এত মূল্য কেন? এখন এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মিকেলসন ও মরলি বিভিন্ন দিকে আলোর গতিবেগ নির্ণয়ের যে পরীক্ষা করেন তাতে এক অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার হয়। তাঁদের পরীক্ষায় দেখা গেল যে, পৃথিবীর চলার পথের দিকে এবং ঐ পথের ডাইনে বা বাঁয়ে সমান পথ অতিক্রম করতে আলোর সমান সময় লাগে। তখনকার বিজ্ঞানীদের ধারণামতে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কারণ, যে দিকে পৃথিবীর গতি সে দিকের এক মাইল দূরবর্তী কোন স্থান হতে আলো প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় দর্শকের নিকট ফিরে আসতে যে সময় লাগবে তা পৃথিবীর গতিবেগের সহিত আলোর গতিবেগ ও দিক সংযোগ করে গণনায় নির্ণয় করা যায়। সেরূপ পৃথিবীর গতির ডাইনে বা বাঁয়ে একমাইল দূরবর্তী কোন স্থান হতে আলো প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় দর্শকের নিকট ফিরে আসতে যে সময়ের দরকার হয়, তাও গণনায় ঠিক করা যায়। এরূপ গণনার ফলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর চলার দিকে আলোর যাতায়াতের সময়, সমান পথে তার ডাইনে বা বাঁয়ে যাতায়াতের সময় হতে অনেক বেশী হয়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল যে এ দু'দিকেই আলোর সমান পথে চলতে সমান সময় লাগে। পরীক্ষা এবং গণনার

মধ্যে ঐ বৈষম্যের সমাধান করতে গিয়ে পরম বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাঠক, হয়ত জানতে চাইবেন, এরূপে দুই ভিন্ন দিকে সমান পথে আলোর যাতায়াতের সময় যে সমান হবেনা, এরূপ প্রত্যাশা করবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল কি ? এ কথা সহজে বোঝাবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ঘণ্টায় ৬ মাইল চলতে পারে যদি এরূপ একটি ষ্টীম-লঞ্চ যোগাড় করা যায় তবে এর সাহায্যে আমরা যে কোন নদীর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারি। মনে করা যাক, গঙ্গাবক্ষে প্রিন্সেপস্ ঘাটের সামনে লঞ্চটি বাঁধা আছে। গঙ্গায় যখন ভাঁটা পড়ে তখন স্রোতের বেগ হয় দক্ষিণমুখী ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। লঞ্চটি খুলে এখন যদি নদীর ওপারে পাড়ি দিয়ে ঘাটে ফিরে আসা যায়, ধরা যাক তাতে ঠিক দু'মাইল পথ লঞ্চে করে চলা হয়, এবং এতে আধঘণ্টা সময় লাগে। এখন যদি আবার সে লঞ্চে করে দক্ষিণমুখে স্রোতের অনুকূলে এক মাইল পথ গিয়ে আবার স্রোতের প্রতিকূলে ঘাটে ফিরে আসা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, এবার ঐ সমান পথেই চলাচল করতে লঞ্চের সময় লেগেছে আধ-ঘণ্টারও অনেক বেশি। স্রোতের বেগ জানা থাকলে এ উভয় ক্ষেত্রের প্রত্যেক দিকে লঞ্চে চলাচল করতে কত সময় লাগবে তা' গতিবিদ্যার গণনায় হিসাব করা যায়। এবং এ হিসাব পরীক্ষিত ঘটনায় যে সময়ের বৈষম্য দেখা যায় তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। কাজেই আলো-চলার বেলায় যখন দুই ভিন্ন দিকে সমান পথে চলার সময় সমান হতে দেখা যায়, তখন তা' যে অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে, এতে আর সন্দেহ করবার কারণ কি ? আলো-চলার বেগ যদি সকল ক্ষেত্রেই এক থাকে তবে গণনার ফলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফলের এ ব্যতি-ক্রমের কারণ কি, এরই মীমাংসা করেছেন আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্বে।

আইনষ্টাইনের মতে যাকে আমরা প্রকৃতির বিধান বা নিয়ম বলে মেনে নিতে পারি তা হবে সকল ক্ষেত্রেই, সকল অবস্থাতেই, সকল কালে এবং সকল দেশে অপরিবর্তনীয়। এ স্বীকার করে না নিলে বিজ্ঞান চলতে পারে না। কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটলে তার কারণ

খুজতে হবে অন্যত্র। প্রকৃতির বিধান বা নিয়ম মাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ বা স্বতঃস্বীকার্য রূপে গ্রহণ করতে হবে। এরাই হচ্ছে নিত্য শাশ্বত ও সনাতন সত্য। আলো-চলার বেগ, যাকে আমরা 'সি' বলে প্রকাশ করি এবং যার মান হচ্ছে নির্বাতদেশে সেকেণ্ডে ১৮৬,৩১৭ মাইল, এও হচ্ছে এরূপ একটি পরমসত্য বা প্রকৃতির বিধান। একেই ভিত্তি করে আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ব গড়ে তুলেছেন। এখানে একটি কথা বিশেষ করে বলা আবশ্যক যে, যখনই আমরা আলো-চলার বেগ বা 'সি' এর উল্লেখ করি, তখনই বুঝে নিতে হবে যে, এ হচ্ছে নির্বাত স্থানে বা দেশে আলো-চলার বেগ।

মিকেলসন ও মরলির পরীক্ষার অপ্রত্যাশিত ফলের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী ফিটজগেরাল্ড ও লোরেঞ্জ সিদ্ধান্ত করলেন যে, কোন বস্তুর বেগ যখন বাড়তে থাকে তার বেগের অভিমুখী বিস্তারও ঐ অনুপাতে কমতে থাকে। কিন্তু আইনষ্টাইন এরূপ ব্যাখ্যায় সায় দিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, ঐ অবস্থায় কোন স্থির-দর্শক বস্তুর বিস্তারের কমতির সঙ্গে সঙ্গে সময়ের বিস্তারের বাড়তিও ঘটছে এরূপই প্রকৃতপক্ষে অনুভব করে। অর্থাৎ কোন অচল দর্শক যদি দূরবীনযোগে প্রচণ্ডবেগে চলনশীল কোন উড়োজাহাজে ঝোলান ঘড়ির কাঁটার চলাচল পরীক্ষা করেন, তাহলে তাঁর বোধ হবে যে, ঐ ঘড়ির কাঁটা খুব আস্তে আস্তে চলছে। অর্থাৎ তাঁর নিজের হাতের ঘড়ির কাঁটা যখন ১ মিনিট চলে সেই সময়ে ঐ উড়োজাহাজের ঘড়ির কাঁটা চলবে এক মিনিটেরও কম। অঙ্কযোগে দেখান যায় যে, যদি উড়োজাহাজের বেগ আলোর বেগের সমান হয় তবে ঐ জাহাজের ঘড়ির কাঁটা হবে একেবারেই অচল। অর্থাৎ আমাদের দর্শকের তখন বোধ হবে যে ঐ উড়োজাহাজে কালের প্রবাহ গেছে লোপ হয়ে। ফিটজগেরাল্ড ও লোরেঞ্জের সিদ্ধান্তেও এ অবস্থায় বেগের অভিমুখে বস্তুর বিস্তার হয়ে যায় লোপ। এরূপ অবস্থা উভয়ক্ষেত্রে কল্পনাতীত। কাজেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, জড়জগতের কোন বস্তুই আলোর মত ঐরূপ প্রচণ্ড বেগে চলতে পারেনা। একথার প্রমাণ আরো একটি পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানী কাউফমান (১৯০১ খৃঃ অঃ) ইলেকট্রনের ভর ও গতিবেগের

সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরীক্ষার ফলে দেখতে পেলেন যে, গতিবেগের বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনের ভরও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রেও অঙ্ক-যোগে দেখা যায় যে, যদি ইলেকট্রনের বেগ আলোর বেগের সমান হয়, তাহলে তার ভর হয়ে যাবে অসীম; এ তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভরকেও যাবে অতিক্রম করে। একটি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিদ্যুতকণার ভর হবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভরের চেয়েও বেশি, ঘটনায় এরূপ কখনো ঘটতে পারেনা। এ যেন একটা সৃষ্টিছাড়া অর্থহীন আজগুবি সিদ্ধান্ত। তাই বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে বিশ্ব-জগতের কোন বস্তুই আলো-চলার সমান বেগে চলতে পারে না; তাই আলোর বেগ হচ্ছে সকল বেগের চরম বেগ। যাঁরা গীতা পাঠ করেন তাঁরা হয়ত একারণে আলোর বেগকে ভগবানের বিভূতি বলে আখ্যা দেবেন।

আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে বস্তুর ভর ও শক্তির মধ্যে একটি নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কার করেছেন, যার সঙ্গে আলোর বেগের বা আমাদের 'সি' মার্কা খুঁটির বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, শক্তি এবং বস্তুর ভরের পরস্পর বিনিময় ঘটতে পারে; এদের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নাই। উভয়েই একই সত্বার এপিঠ ওপিঠ মাত্র। অর্থাৎ ভরকে শক্তির মানে, শক্তিকে ভরের মানে প্রকাশ করা যেতে পারে। কোন বস্তুর ভর যদি ৫ গ্রাম হয় তবে তাকে শক্তিতে প্রকাশ করতে হলে তার মান হবে আমাদের 'সি' এর বর্গফলের ৫ এর পূরক। 'সি' এর বর্গফল বলতে কি বুঝায়, একথা পাঠক ভেবে দেখবেন। বিজ্ঞানীদের চলতি প্রথায় 'সি' এর মানে হচ্ছে প্রায় সেকেণ্ডে তিন হাজার কোটি সেণ্টিমিটার (৩০০,০০০,০০০,০০) অর্থাৎ প্রায় ১৮৬,৬০০ মাইল। এই তিন হাজার কোটি সেণ্টিমিটারের বর্গফলকে ৫ দিয়ে পূরণ করলে যে সংখ্যা হবে সে পরিমাণের শক্তি আমরা পাব ৫ গ্রাম ওজনের কোন বস্তুকে ভাঙ্গিয়ে। এ হ'তে পাঠক অনুমান করতে পারেন, কি অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডায় হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র জড়কণা বা জড়াণু। গণনায় দেখান যায় যে, আধসের ওজনের বালিকে যদি সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়ে

শক্তিতে পরিণত করা যায়, তবে দশ লক্ষ টন ডিনামাইটের সমান হবে তার ধ্বংসের ক্ষমতা। একথায় যদি কারো বিশ্বাস না জন্মে, তবে তিনি একবার জাপানে গিয়ে হিরোশিমা ও নাগাসাকি সহর দুটোর ধ্বংসাবশেষ দেখে আসতে পারেন।

আলোর বেগকেই পরম বেগ মেনে নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান অভাবনীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। তাই বিজ্ঞানের বহু সূত্র, রাশি, সমীকরণ ও তত্ত্বের মধ্যে 'সি' এর এত প্রাধান্য দেখা যায়। এ কারণে আলো চলাচলের বেগ বা 'সি' হয়েছে বিজ্ঞানের একটি প্রধান খুঁটি।

২নং খুঁটি মহাকর্ষজনিত গতিবেগের বৃদ্ধিহার—'জি' (g)

এখন আমরা ২নং খুঁটি সম্বন্ধে আলোচনা করব। বিজ্ঞানে এর ডাক নাম হচ্ছে 'জি'। 'জি' বলতে বোঝায়—কোন পতনশীল বস্তুর বেগের বৃদ্ধিহার। কোন বস্তু কি করে উপর হতে মাটির দিকে পড়তে থাকে তার প্রথম পরীক্ষা করেন ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। তিনি দেখলেন ভারি, হাল্কা, ছোট, বড় সব জিনিষই নির্বাত-স্থানে এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে এক সঙ্গেই মাটিতে এসে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানী নিউটনকেই এর কারণের আবিষ্কর্তা বলা যায়। গাছ থেকে আপেল পড়বার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মহাকর্ষ-বলের প্রতিষ্ঠা ও 'জি' এর আবিষ্কার করেন। এসব কথা হয়ত অনেকেই অবগত আছেন। তিনি পরীক্ষায় দেখতে পেলেন যে, 'জি' এর মান হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ ফিট। অর্থাৎ উড়োজাহাজে করে যাবার সময় কেহ যদি একটি পাথরের টুকরা ঐ জাহাজ হ'তে ফেলে দেয়, তবে উহা অল্প সময়ের মধ্যেই মাটিতে এসে পড়বে। এর মাটির দিকে পড়বার গতিবেগ যদি নির্ণয় করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে, প্রথম সেকেণ্ডের পর পাথরখণ্ডটির বেগ হবে ৩২ ফিট, দ্বিতীয় সেকেণ্ডের পর এর বেগ হবে ২ × ৩২ ফিট, তৃতীয় সেকেণ্ডের পর এর গতি হবে ৩ × ৩২ ফিট······ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতি সেকেণ্ডে

এর বেগের মান বেড়ে যায় ৩২ ফিট করে। এরূপ বেগ বাড়বার হারকে 'জি' বলে নামকরণ করা হয়েছে। একেই আশ্রয় করে নিউটন বলের সংজ্ঞা এবং গতির নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। এ-সব নিয়মকে ভিত্তি করেই বল-বিজ্ঞানের অপূর্ব সৌধ ও বিজ্ঞানের হেতুবাদ বা কার্যকারণ-তত্ব গড়ে উঠেছে। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তাকে এ কারণে নিউটনের বিশ্বজগৎ বলা হয়ে থাকে। তাই 'জি' হয়েছে বিজ্ঞানের আর একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য খুঁটি। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে এর অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি। যদিও বিংশ শতাব্দীতে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব প্রতিষ্ঠার পর এর মাহাত্ম্য গেছে কিছু খর্ব হয়ে, তথাপি তার প্রাধান্যের কিছু হানি ঘটেনি, শুধু এর নিদান-তত্ব গেছে বদলে। নিউটনের মতে বিশ্বজগতের শৃঙ্খলার মূলে ছিল মহাকর্ষ-বল। এবং মহাকর্ষ-বল ছিল পতনবেগের বৃদ্ধিহার 'জি' এর জন্মদাতা। আইনষ্টাইনের বিশ্ব-জগতে এ মহাকর্ষ-বল গেছে বাতিল হয়ে। দেশের অবয়ব বা জ্যামিতির বিশেষত্ব হ'তেই এখন গ্রহ উপগ্রহাদি হতে আরম্ভ করে সকল জড়পদার্থের গতিবিধি বর্ণনা করা যেতে পারে। পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, দেশের অবয়ব বা জ্যামিতি আবার কি? দেশ বলতে আমাদের যে সাধারণ ধারণা, তা হচ্ছে ঊর্ধ্ব, অধঃ, অগ্র, পশ্চাত এবং ডাইনে বাঁয়ে আকাশের বা শূন্যের বিস্তার। এ দেশকে তাই আমরা সাধারণতঃ ত্রৈমাত্রিক বলে থাকি। কিন্তু আইনষ্টাইনের প্রবর্তিত দেশের জ্যামিতি হচ্ছে চতুর্মাত্রিক। আমাদের ব্যবহারিক ত্রৈমাত্রিক দেশের সঙ্গে একমাত্রিক কালের সংযোজনা করে এ চতুর্মাত্রিক দেশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ চতুর্মাত্রিক দেশের জ্যামিতি হচ্ছে অসমতল। পতনশীল পদার্থের বেগবৃদ্ধির হার বা 'জি' এর মান এ হতে সঠিক নির্ণয় করা যায়। পাঠক হয়ত আপত্তি করবেন যে, বিষয়টিকে আমি একেবারে দুর্বোধ্য এবং জটিল করে তুলছি। অতএব এ নিয়ে আর অধিক অলোচনা করা সংগত নয়। সত্যই বিষয়টা জটিল। তবে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'জি' এর স্থান নির্ণয়। তাই বৈজ্ঞানিক মতবাদের গুরুত্বের

দিক হতে ভেবে দেখলে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের ২নং খুঁটি হ'বার এ সম্পূর্ণ উপযোগী।

৩নং খুঁটি ক্রিয়ার একক-'এইচ' (h)

ক্রিয়ার একক হচ্ছে বিজ্ঞানের ৩নং খুঁটি। এর সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হয়েছে 'h'। জার্মান বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক হচ্ছেন এর প্রবর্তক এবং আইনষ্টাইন হচ্ছেন এর পরিপোষক। আধুনিক বিজ্ঞানে এর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। ক্রিয়ার একক বলতে কি বোঝায় প্রথমেই এর উত্তর দিতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, তেজঃশক্তি সর্বব্যাপী ইথর বা ব্যোমের মধ্যে স্পন্দন তুলে স্রোতের মত চলাচল করে; অর্থাৎ একে দানাদার বা কণিকা বিশিষ্ট বলা যায় না। এক মুঠো বালির মধ্যে একটি কণা যে আর একটি কণা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, এ আমরা সহজে দেখতে পাই। কিন্তু জলের উপর যখন ঢেউ খেলে যায় তখন সে ঢেউএর পংক্তিতে কোন বিরাম থাকে না; এও আমরা সর্বদা দেখতে পাই, এবং সাধারণতঃ বিশ্বাস করি। জলাশয়ের স্থির জলে কোন জায়গায় ঢিল পড়লে তার আন্দোলন যেমন চারধারে তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে যায়, সেরূপ তেজঃশক্তিও ছড়িয়ে পড়ে শূন্যাকাশে বা ইথরের মধ্যে তরঙ্গ তুলে। ফলে, জড়ের বিশিষ্ট ধর্ম যে অণু-প্রকৃতি এবং শক্তির বিশিষ্ট ধর্ম যে তরঙ্গ-প্রকৃতি, অর্থাৎ মেসিনগানের বা কলের কামানের গুলির মত শক্তির চলাচল হতে পারে না, ইহাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত। আলো-চলাচল সম্বন্ধে কিন্তু নিউটনের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। নিউটনের মতে কোন দীপ্তিমান পদার্থ হতে যে আলোকরশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তা সব আলোককণিকার সমষ্টিতে গঠিত; আলোকণিকার ধারাবর্ষণে দীপ্তিমান পদার্থ সমূহ তাদের সন্নিহিত প্রদেশ আলোকিত করে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক তাপরশ্মির বিকিরণের নিয়ম পরীক্ষা করে প্রমাণ দিলেন যে, তাপশক্তির বিকিরণ ও শোষণ একটানা বা অবিরাম ঘটতে পারে না। এর ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, তাপ-

রশ্মিকে তাপ কণিকার সমষ্টিরূপে মনে করা যেতে পারে। ইহাই হল প্লাঙ্কের শক্তিকণিকা বাদ। আলোকশক্তির বেলাতেও যে এরূপ কণিকার ধর্ম বর্তমান রয়েছে, তা' প্রচার করলেন আইনষ্টাইন। এসব আলোক-কণিকার নাম হচ্ছে ফোটন। আলোর গতিবেগের সমান হচ্ছে এদের গতি। নিউটনের আলোক কণিকা-বাদ যেন এতে পুনর্জন্ম লাভ করল। এতে প্রমাণ হল যে, তেজঃশক্তিও অবস্থাবিশেষে জড়ের বিশিষ্ট ধর্ম—অণুপ্রকৃতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এসব তেজাণু ও জড়াণুর মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। আমরা জানি, জড়-জগতে ৯২ প্রকার মৌলিক পদার্থ রয়েছে। এরা ৯২ প্রকার বিভিন্ন অণুতে গঠিত। এর সঙ্গে যদি একস্থানিক (isotopes) মূল পদার্থ-গুলিকেও যোগ করা যায়, তা হ'লে এসব বিভিন্ন জড়াণুর সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু প্লাঙ্কের মতে তেজঃশক্তির বিভিন্ন অণুর সংখ্যার কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই। তেজ তরঙ্গের প্রত্যেক দৈর্ঘ্যের বা প্রত্যেক স্পন্দনমাত্রার অনুযায়ী এক এক প্রকার তেজাণুর সৃষ্টি হতে পারে। এক একটি তেজাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি তেজ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা কম্পনমাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ঠ। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেশি হলে বা তার কম্পনমাত্রা কম হলে তেজাণুর শক্তিসমষ্টিও যায় কমে। তেজাণুর শক্তির সহিত তার কম্পনমাত্রার যে সঠিক সম্বন্ধ তা প্রকাশ করা হয় একটি ধ্রুবক বা নিত্যসংখ্যার সাহায্যে। এরই সাঙ্কেতিক চিহ্ন হচ্ছে 'এইচ'। কোন বিশিষ্ট তেজরশ্মির কম্পনমাত্রাকে যদি নিত্যসংখ্যা 'এইচ' দিয়ে গুণ করা যায় তবে সে গুণফলই হবে উক্ত তেজাণুর শক্তির মান। কম্পন বা স্পন্দনমাত্রা কাকে বলে তা হয়ত পাঠক জানতে চাইবেন। প্রতি সেকেণ্ডে কোন স্থানে তেজতরঙ্গের যতটা পূর্ণ স্পন্দন বা কম্পন হয় তাকেই তার স্পন্দন বা কম্পনমাত্রা বলা হয়। ইহা তেজ তরঙ্গের গতিবেগ ও দৈর্ঘ্যের ভাগফল। তেজাণুর শক্তি ও তেজ তরঙ্গের কম্পনমাত্রার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়কারী নিত্যসংখ্যা 'এইচ'-কে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বা প্লাঙ্কের নিত্যসংখা বলা হয়। এ হচ্ছে প্রকৃতির একটি সনাতন বা শাশ্বত নিত্যসংখ্যা। এ ধ্রুবক বা নিত্যসংখ্যার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানের

বহু জটিল সমস্যার সমাধান হয়েছে। একেই কেন্দ্র করে আধুনিক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে বললে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। এ ধ্রুবকের মান হচ্ছে—৬·৫৫ × ১০-২৭ আর্গ সেকেণ্ড। একে 'ক্রিয়ার একক' বলা হয়; কারণ এ হচ্ছে শক্তি এবং তেজ তরঙ্গের একটি মাত্র কম্পনের কালের গুণফল। বল-বিজ্ঞানে শক্তি এবং কালের গুণফলের নাম হচ্ছে 'ক্রিয়া'। এসব তেজাণু বা ফোটনের একটি অদ্ভূত বিশেষত্ব আছে। যদিও এরা শক্তিসামর্থ্যে সবাই সমান হয় না, তথাপি এরা যখন আকাশপথে ছোটাছুটি করে তখন এদের সবারই গতিবেগ হয় সমান। এ গতিবেগ হচ্ছে আলোর গতিবেগ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,৩১৭ মাইল। ফোটনের দেশে রাষ্ট্রতন্ত্র হচ্ছে পুরাদস্তর কমিউ-নিষ্টিক, এখানে ধনী দরিদ্রে জাতিভেদ নেই। ২নং খুঁটির আলোচনায়ও আমরা দেখেছি যে ছোট, বড়, মাঝারি, ভারী, হাল্কা, সকল রকমের জিনিষই যখন এক সঙ্গে আকাশ হতে মাটির দিকে পড়তে থাকে তখন তাদেরও গতিবেগ সব সমান হয়। তেজাণু এবং জড়াণুর ধর্ম এখানে যাচ্ছে মিলে।

বিজ্ঞানে এ শক্তিকণিকাবাদের প্রবর্তনের ফলে জড়ের ও শক্তির স্বাতন্ত্র্য গেছে ঘুচে। সে-সব বিষয় এখানে বিস্তারিত আলোচনা করবার উপযোগী স্থান নয়।

ক্রিয়ার একক বা 'এইচ' আধুনিক বিজ্ঞানের যে একটি প্রধান খুঁটি এই ছিল আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। পরমাণু বিজ্ঞানের যাবতীয় তত্ত্ববাদ একেই আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বিজ্ঞানের বিশ্বরাজ্যকে বিজ্ঞানীরা তিনটি বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে থাকেন, সূক্ষ্ম, বিশাল ও মাঝারি। বিজ্ঞানের এ তিনটি প্রদেশ-এ তিনটি খুঁটিকে আশ্রয় করে অবস্থিতি করছে; অণুপরমাণুরূপ সূক্ষ্ম রাজ্যের আশ্রয় হচ্ছে ৩নং খুঁটি 'এইচ', আমাদের ব্যবহারিক মাঝারি জগতের ভিত্তি হচ্ছে ২নং খুঁটি 'জি', এবং বিশাল নক্ষত্ররাজ্য যার উপর অবস্থিতি করছে সে হচ্ছে ১নং খুঁটি 'সি'।

বিজ্ঞানের তিনটি খুঁটির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ধর্ম যদি চতুষ্পদের সম্মান দাবী করতে পারে, বিজ্ঞানের দাবীও তা হ'তে বড় কম যায় না।

বিজ্ঞান ও সভ্যতা

জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে। বিজ্ঞানীরা একে কোন আকস্মিক ঘটনা হিসাবে গণ্য করেন না। বিশ্ব স্থষ্টির পশ্চাতে যে প্রেরণা, যার ফলে স্থষ্টিপ্রক্রিয়া চলেছে অব্যাহতভাবে অনন্তকাল ধরে, সে হ'ল এক অভিব্যক্তির অন্ধশক্তি। এ হচ্ছে বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডারউইনের সিদ্ধান্ত। নানা ভুল-ভ্রান্তির বাধা কাটিয়ে এ শক্তি বিশ্বজগতকে নিয়ে এসেছে তার বর্ত্তমান অবস্থায় ক্রমবিকাশের ধারা ধরে। মানুষের স্থষ্টিতেই সে আপাতত পেয়েছে তার চরম পরিণতি। মানুষের অভিব্যক্তির সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে তার চিন্তা, ধারণা ও প্রকাশের শক্তি। এ-কারণে সে আজ জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব, এ হ'তেই গড়ে উঠেছে তার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কার। জীবের অভি-ব্যক্তি সম্বন্ধে ডারউইন-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ হুবহু মেনে নিতে এখনো হয়ত অনেকে রাজী হবেন না।

মানবের ইতিহাসে বহু সভ্যতার উত্থান-পতনের বিবররণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে এ সব সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল; মিশরে, মেসোপোটেমিয়ায়, সিন্ধুপ্রদেশের উপত্যকায়, পেরুতে, গ্রীসে, চীনে, বেবিলোনিয়ায়, ও ভারতবর্ষে যে সব সভ্যতা পুরাকালে গড়ে উঠেছিল তাদের বিবরণ আমাদের অবিদিত নয়। আধুনিক সভ্যতা —যাকে আমরা বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বলে থাকি, এবং যার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট—তার গতিবিধি ও প্রভাব আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি। বিশ্লেষণ করলে আধুনিক সভ্যতা এবং পৌরাণিক সভ্যতার মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ

দেখতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক সভ্যতাসমূহকে অন্তর্মুখীন এবং আধুনিক সভ্যতাকে বহির্মুখীন সভ্যতা বলে নাম দিলে সম্ভবতঃ এ প্রভেদটি সহজে নজরে পড়ে।

অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এবং তাদের উৎপত্তির কারণ আলোচনা করার আগে সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এক কথায় বলতে গেলে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত উন্নতিকেই সভ্যতা বলা যেতে পারে। এ উন্নতি আংশিকও হতে পারে, সর্ব্বাঙ্গীণও হতে পারে। দেহ ও মন নিয়ে মানুষ। দেহের ধর্ম্মে মানুষ এবং অন্য জীবে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু তার মনের ধর্ম্ম হচ্ছে খুব জটিল। এ মনের ধর্ম্মকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে মন দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক পাতায়, যাতে মানুষের জৈবধর্ম্মের পরিতৃপ্তি ঘটে ; কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদি প্রবৃত্তি এরই অন্তর্গত। অন্য ভাগে মন মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করে তোলে ; এর ফলে মানুষ খোঁজে সত্যের, আনন্দের ও অমৃতের পথ। এরই প্রেরণায় তার জেগে ওঠে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ও সত্যের জিজ্ঞাসা। মানুষের অহিংসা, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, দয়া, সেবা ও ত্যাগ ইত্যাদি সৎপ্রবৃত্তি এ হ'তেই প্রকাশ পায়। এবং এরই ফলে তার মানবধর্ম্মের পরিতৃপ্তি ঘটে। তাই দৈব ও আসুরিক সম্পদ বলে গীতায় দু'শ্রেণীর ধর্ম্মের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। মনের দেহগত প্রবৃত্তি ও দেহাতীত প্রবৃত্তির তারতম্যের ফলে মানুষের ও সমাজের রূপ যায় বদলে। তাই দেখা যায় মানুষের সমাজে যেখানে এ দেহগত প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে সেখানে সভ্যতার বিকাশ হয় বহির্মুখীন ; আর যে সমাজে মনের দেহাতীত বৃত্তির প্রাধান্য ঘটে সেখানে সভ্যতা হয় অন্তর্মুখীন।

আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাতে মনের দেহাতীত বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই ছিল সব চেয়ে বড় আদর্শ ; তাই সে সভ্যতায় ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সকলের উপরে। ব্রাহ্মণ বলতে এখানে কেউ আশা করি এ শব্দটির সাম্প্রদায়িক অর্থ গ্রহণ করবেন না। ক্ষমতা, অর্থ, অহঙ্কার ও দেহের সুখসম্ভোগের মোহ থেকে যাঁরা নিজকে মুক্ত

INSTITUTE OF ADVANCED ST
Acc. No. 9494

করে ত্যাগ, সেবা ও জ্ঞানের সাধনায় রত হয়ে মানুষকে কল্যাণের পথে, মুক্তির পথে, শান্তির পথে পরিচালনা করেছেন, তাঁরাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। রাজকার্য্যে ও রাজ্যশাসনে এঁরা ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। বিখ্যাত গ্রীস দার্শনিক প্লেটো তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে যে আদর্শরাজ্যের বা ইউটোপিয়ার চিত্র কল্পনা করেছেন তাতে এরূপ ত্যাগী, জ্ঞানী ও বিজ্ঞলোককেই তিনি একমাত্র রাজ্যশাসনের উপযোগী বলে বর্ণনা করে গেছেন। প্লেটোর এই ইউটোপিয়ার অনুরূপ রাজ্যের নমুনা আমরা দেখতে পাই ইউরোপের মধ্যযুগে। এ যুগে কেথলিক ধর্ম্মযাজকের নেতা রোমের পোপের প্রাধান্য ছিল অপ্রতিহত। তাঁরই অনুমোদনে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে শাসনকার্য্য তখন নির্ব্বাহ হ'ত বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় ব্রাহ্মণপ্রমুখ প্রাচীন আর্যসভ্যতা এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় পোপ-পরিচালিত সভ্যতা এ উভয়েরই অবশেষে পতন ঘটে। কারণ কালক্রমে বহু অনাচার, বীভৎস রীতিনীতি, অত্যাচার, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ক্ষমতার মোহে উভয় সভ্যতা কলুষিত হয়ে উঠে।

ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে যখন বিজ্ঞানচর্চ্চার সুরু হয়, তখন থেকেই আরম্ভ হ'ল আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগ। বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে মানুষ আবিষ্কার করল জড় ও শক্তির স্বরূপ এবং প্রাকৃতিক বিধি-ব্যবস্থা। বিজ্ঞানের এ জ্ঞানকে সে কাজে লাগিয়ে অর্জ্জন করল অসীম ক্ষমতা এবং অর্থ। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আজ চলেছে তার যানবাহন। বিমানপোতে, রেডিওতে ও বেতারযোগে দেশকালের ব্যবধানকে জয় করে সে উড়াল তার বিজয় নিশান। দিনে দিনে তার বেড়ে উঠছে সুখসম্ভোগ ও বিলাসের উপকরণ বিচিত্রতার সকল সীমা ছাড়িয়ে। মানুষের দেহের ধর্ম্মের ও তার মনের দেহগত প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই হ'ল এ বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিশেষত্ব। তাই একে বলা যায় বহির্মুখীন বা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা।

ক্ষমতা এবং অর্থের অর্জ্জন হ'ল এ সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এরই প্রতিযোগিতায় আজ মানুষের স্বার্থে স্বার্থে অহরহ সংঘাত ঘটছে, এবং তার লোভে লোভে সংগ্রাম চলেছে। এ দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ ক্রমশঃ বর্ণে

বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, পরিশেষে জাতিতে জাতিতে বা জাতিসংঘের সঙ্গে জাতিসংঘে সংক্রামিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছে। পৃথিবী জুড়ে যে দুটি মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এতেই তার প্রমাণ হয়। গত মহাযুদ্ধে যে বিপুল হত্যাকাণ্ড, ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ও অপরিসীম বর্ব্বরতার অভিনয় দেখা গেল, যার ফলে এখনও দেশে দেশে বিদ্রোহ, অশান্তি এবং উত্তেজনার চঞ্চলতা প্রবল হয়ে উঠছে, অন্নাভাবে আশ্রয়হীন লক্ষ লক্ষ নরনারী হাহাকারে আর্ত্তনাদ করছে, হিংসা-বিদ্বেষ ও দুর্নীতিতে মানবসমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে, এর তুলনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার উপর এটম ও হাইড্রোজেন বোমার সাহায্যে ভাবী যুদ্ধের আশঙ্কায় পৃথিবীবাসী আজ শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত। এ হতে অনেকে অনুমান করেন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পতনকাল আসন্নপ্রায়।

কি করে এ সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, এ নিয়ে আজ দেশে বিদেশে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এরই ফলে সকল জাতির রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিয়ে ইউনাইটেড নেশন নামে যে সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা কারো অজানা নয়। এ হ'ল পুলিশ বা মিলিটারীর সাহায্যে শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থার অনুরূপ। পুলিশের সাহায্যে সমাজের বাহ্যিক শান্তি ও শৃঙ্খলা অনেক সময় রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু তাতে অসাধুকে সাধু করা চলে না। মারের ভয়ে প্রকাশ্যে চুরিডাকাতি না হতে পারে, কিন্তু চোরডাকাতের মনোবৃত্তি তাতে বদলায় না। সুযোগ সুবিধা পেলেই তারা আপন কাজে লেগে যায়। অনেকে তাই মনে করেন যে, শুধু ইউনাইটেড নেশনের সংগঠনের সাহায্যে পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে শান্তিরক্ষার সম্ভাবনা কম। তাঁদের এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক নয় তার প্রমাণের অভাব নেই। কারণ ইতিমধ্যেই এই সর্ব্বজাতিসংগঠনে বহু দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, কোন জাতি বা রাষ্ট্র শান্তিভঙ্গে উদ্যোগী হলে তাকে বাধা দেবার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা করাও এ সংগঠনের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

তাই অনেক পণ্ডিত ও বিজ্ঞ জন মনে করেন যে, পৃথিবীতে শান্তি-রক্ষা করতে হলে মানুষের মনোবৃত্তির সংস্কারের দিকেই নজর দিতে

হবে প্রথম ; মানুষের মনের দেহগত প্রবৃত্তিকে তার দেহাতীত প্রবৃত্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করে তুলতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথে মানুষের শান্তিলাভের উপায় নেই। যে মহাপুরুষ আমাদের দেশে জন্ম নিয়ে দেশকে মুক্তির পথে, স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করে গেছেন, তিনি ছিলেন এ মহাবাণী ও সত্যের প্রধান পুরোহিত। এ ছিল তাঁর জীবনের সাধনা ;—এবং আপন জীবনদান করে তিনি তাঁর দেশবাসী আমাদের জন্য ও বিশ্বমানবের জন্য এ শান্তির পথ নির্দ্দেশ করে গেছেন।

আধুনিক সভ্যতাকে আত্মঘাতের ভীতি থেকে রক্ষা করতে হলে মানুষের মনের দেহাতীত প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। মানুষের জৈবধর্ম্মের সঙ্গে তার মানবধর্ম্মের, তার আসুরিক সম্পদের সঙ্গে দৈবা সম্পদের সমন্বয় করতে হবে। পুরাযুগের অন্তর্মুখীন সভ্যতায় মানুষের জৈবধর্ম্মেকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে দেখা যায়। তাতে বাস্তবের সঙ্গে জীবনের সংযোগ ছিল শিথিল হয়ে। প্রতিকূল অবস্থার প্রতিঘাতে তাই এ সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে পারেনি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা কিন্তু গড়ে উঠেছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত পথে। এ সভ্যতায় মানুষের জৈবধর্ম্মের পরিতৃপ্তি বেড়ে উঠেছে অসংযতভাবে আপন কল্যাণের সীমা অতিক্রম করে এবং তার মানবধর্ম্মকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে। তাই এ সভ্যতারও অবনতির আশঙ্কা আজ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। বহু বিজ্ঞানীও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পরিণাম চিন্তা করে সতর্ক হয়ে উঠেছেন। বিজ্ঞানের চর্চ্চায়, প্রয়োগে বা বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে যাঁরা সংলিপ্ত, অথবা যাঁরা বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজের জীবিকা, অর্থ বা ক্ষমতা অর্জ্জন করছেন, এরূপ কোন ব্যক্তিকে আমি বিজ্ঞানী বলতে চাই না। এঁরা বিজ্ঞানের কর্ম্মী হতে পারেন—কিন্তু বিজ্ঞানী নন। পৃথিবীতে হাজার হাজার বিজ্ঞান-কর্ম্মী রয়েছে, যাঁরা বিজ্ঞানকে ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছেন ;—কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানীর সংখ্যা বিরল। বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন সত্যের উপাসক ; সত্যের সাধনাই হচ্ছে এঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

বিজ্ঞানী বলতে আমি মনে করি নিউটন, ফ্যারাডে, পাস্তুর, হেলমহোল্‌জ, মেণ্ডেলিফ, র‍্যদারফোর্ড, মাদাম কুরী, প্লাঙ্ক এবং

আইনষ্টাইনের মত মনীষীগণকেই। বিজ্ঞান মানুষের মনের দেহগত ও দেহাতীত উভয় প্রবৃত্তিরই খোরাক জোগায়। মানুষের জৈবধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম এ উভয়েরই পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে বিজ্ঞানে। আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রয়োগ করে মানুষ শুধু তার জৈব-ধর্ম্মের পরিতৃপ্তিকে বাড়িয়ে তোলবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এর ফলে বিজ্ঞানের সত্যের দিক, তার জ্ঞানের দিক্,—যাতে মানুষের মানবধর্ম্ম বা তার মনের দেহাতীত প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে,—তা পড়েছে সম্পূর্ণ চাপা। এক কথায় বলতে গেলে বর্ত্তমান যুগে যাঁরা বিজ্ঞানের প্রয়োগ করছেন, বা তার বিস্তৃত প্রয়োগের ব্যবস্থা যাঁদের হাতে, তাঁদের অধিকাংশেরই মনোবৃত্তি হচ্ছে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। অথবা বলতে হয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করতে পারে নি। এ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি হচ্ছে আগে যাকে আমরা বলেছি মানুষের মনের দেহাতীত প্রবৃত্তি। কারণ, সত্যের অনুসরণ ও আবিষ্কারই হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। একেই ভিত্তি করে বিজ্ঞানের বিচিত্র সৌধ গড়ে উঠেছে। ফ্যারাডে, নিউটন, হেলমহোলজ বা আইন-ষ্টাইন এঁরা কেউ অর্থের বা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞানের সেবা করেছিলেন, এ কথা বললে বাতুলতা হয়। পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারলব্ধ সত্যই হচ্ছে বিজ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি; তাই মানুষের মনকে মোহ ও সংস্কার মুক্ত করতে এবং তার বুদ্ধিকে সতর্ক করে তুলতে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন।

এ কারণেই বিজ্ঞানে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা বা শ্রেণীবিভাগ থাকতে পারে না। বিজ্ঞানকে তাই বলা হয় আন্তর্জাতিক বিশ্ব-মানবের সম্পত্তি। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রয়োগবিজ্ঞানের অসংযত বাড়তিতে বিজ্ঞানের এ প্রকৃত ধারা ও প্রকৃতি পড়েছে ঢাকা। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার ব্যবস্থা হচ্ছে শুধু ক্ষমতা এবং অর্থের আহরণে। এতেই সৃষ্টি হচ্ছে যত অনর্থের। প্রয়োগবিজ্ঞানের অপব্যবহারকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির উৎকর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে আধুনিক সভ্যতার সব

কীর্ত্তিকলাপ পরমাণু বোমার প্রবল বর্ষণে যাবে অচিরে বিলুপ্ত হয়ে।

সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে বর্ত্তমান সভ্যতায় আরো কয়েকটি বিকারের বা পতনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে এর আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে করি; কেননা সাধারণের এদিকে বড় নজর নেই। আধুনিক সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতা বললে অত্যুক্তি হয় না। নগরগুলিকে কেন্দ্র করেই আধুনিক সভ্যতার যা কিছু কর্মকৌশল, শিল্পকলা ও শিক্ষাদীক্ষা গড়ে উঠেছে। তাই সহরে এসে বাস করার জন্য সকল লোকেই চেষ্টা করে—কতকটা রোজগারের সুবিধার জন্য এবং কতকটা সহরের আরাম-আমেদের জন্য। কাজেই বর্ত্তমান সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই যে, বড় বড় সহরগুলিতে ক্রমশঃ লোকসংখ্যা অপ্রত্যাশিতরূপে বেড়ে উঠেছে। প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্র এ সহরগুলির উন্নতির জন্যই নজর দিচ্ছে বেশী। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, কলকারখানা, দোকানপাট, ব্যবসা বাণিজ্য,—সবারই প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সহরে। কিন্তু অন্য দিকে সহরের কৃত্রিম আবহাওয়ায় এবং সদ্যোজাত সারবান স্বাভাবিক খাদ্যের অভাবে সহরবাসীর স্বাস্থ্য যায় কালক্রমে দুর্ব্বল হয়ে; সহরের কর্ম্মকোলাহলের ব্যস্ততায়, শারীরিক পরিশ্রমেয় অভাবে, অনিয়মিত আরাম, লঘু আমোদ-প্রমোদ এবং নানাবিধ ব্যসনে তাদের স্নায়ুকেন্দ্র ও মনের স্বাস্থ্য যায় বিকল হয়ে। তাই দেখা যায় যে-সব পরিবার পুরুষানুক্রমে সহরে বাস করে, তাদের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে উঠে। গ্রাম থেকে নূতন নূতন পরিবার এসে সহরের জীবনীশক্তি বজায় রাখে। কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলতে পারে না। গ্রামগুলি অবহেলায় ক্রমশঃ শ্রীহীন ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। কালক্রমে গ্রাম থেকে সুস্থ সবল দেহমন নিয়ে সহরের জীবন বাঁচিয়ে রাখবার জন্য নিত্য নূতন নরনারীর আমদানী যাবে কমে। পরিণামে সহরগুলির পতন হবে অনিবার্য্য। সহরগুলির সঙ্গে সঙ্গে এ নাগরিক সভ্যতাও যাবে বিলোপ হয়ে। গ্রীক এবং রোমীয় সভ্যতারও বিলোপ ঘটেছিল এইরূপে। এর সাক্ষী ইতিহাসে রয়েছে।

বড় বড় সহরগুলিতে ক্ষমতা এবং অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠায় গ্রামের জমিজমা ছেড়ে লোকজন সহরে এসে জমা হচ্ছে; এতে ঘরছাড়া ভবঘুরে শ্রমিকের দল যাচ্ছে বেড়ে।

সহরের অস্বাভাবিক জীবনযাপনের ফলে লোকের দেহ এবং মন উভয় যায় দুর্ব্বল হয়ে; ফলে জনতার নেতৃবৃন্দই হয় রাজনীতির পরিচালক। স্বেচ্ছাচারী রাজার মত এই সব জনতার নেতা হয়ে ওঠে তখন স্বেচ্ছাচারী এবং দুর্দ্ধর্ষ শাসক। এই সব স্বেচ্ছাচারী শাসক বা শাসনতন্ত্র তখন সকল মানুষকেই রাষ্টনীতির ছাঁচে ঢেলে সমান করে তুলতে চায়। রাষ্ট্রনীতির প্রবল পেষণে মানুষের মনুষ্যত্ব যায় পিষ্ঠ হয়ে। যন্ত্রের মত, কলের মত তাদের জীবনযাত্রা চলে সকল ভাবনা-চিন্তার বালাই এড়িয়ে; রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের নেতা হয়ে ওঠে তাদের কাছে ভগবান। ঘাটে, মাঠে, পথে গেয়ে বেড়ায় তারা রাষ্ট্রদেবতার জয়গান। মানুষের চিন্তাধারা এবং মানুষের সৃষ্টিশক্তির বৈচিত্র্যকে যখন এরূপে বিনষ্ট করা হয়, মানুষেব সভ্যতার ও তার জাতীয় পতনের সুরু হয় তখন। রোম এবং চীনের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংস ঘটেছিল এইভাবে। রাশিয়া এবং আমেরিকাতেও আজ এভাবে সভ্যতার পতনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এ হল অনেক আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। এর পশ্চাতে রয়েছে কিন্তু একটি বড় রকমের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববাদ।

জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, জীবনের মূলে যে প্রেরণা সে হচ্ছে সৃষ্টির প্রেরণা। এ প্রেরণার ফলে বিশৃঙ্খলার একাকার থেকে বৈচিত্র্যের শৃঙ্খলা উঠে গড়ে। তাই বিজ্ঞানের মতে যেখানে শৃঙ্খলার ঐক্য-সূত্রে বদ্ধ হয়ে বৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটে, সেখানে হয় জীবনের জাগরণ। আর যেখানে সকল বৈচিত্র্যের বিলোপ ঘটে—সে হল মৃত্যুর লক্ষণ।

দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটি আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে। মানুষ বেঁচে থাকে বহির্জগৎ থেকে আহার, পানীয় ও বায়ু গ্রহণ করে। মানুয়ের দেহের অভ্যন্তরে এ-সব নির্জীব জড়পদার্থগুলি অংশতঃ তাদের বিভিন্ন উপাদানে ভেঙ্গে শরীর থেকে নিশ্বাস, স্বেদ, এবং মল-

মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের দেহ বহির্জগৎ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে, ততদিন সে জীবিত থাকে। সুতরাং বলা যায়, জীবনের মূলে যে-শক্তি রয়েছে তার সাহায্যে মানুষ বাইরের জড়জগৎ থেকে খাদ্যরূপে ও পানীয়রূপে বিবিধ আণবিক সংহতির শৃঙ্খলা গ্রহন করে' দেহের জীবন বা বৈচিত্র্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে। অন্যথা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, সমস্ত জড়জগৎ যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী তা হচ্ছে—বিশ্বজগতে যা কিছু পরিবর্ত্তন আমরা দেখতে পাই তাতে বস্তুমাত্রই বৈষম্য থেকে সাম্যের, বা শৃঙ্খলা হতে বিশৃঙ্খলার একাকারের অবস্থায় অহরহ পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ যে কোন জড়াণু বা জড়বস্তুর সংহতির মধ্যে যখন বাহ্যিক শক্তির প্রভাব ছাড়া আপনা থেকে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন ঐ জড়াণু বা জড়বস্তুর সংহতি ক্রমশঃ শৃঙ্খলার অবস্থা থেকে যায় বিশৃঙ্খলার অবস্থায় পরিণত হয়ে। এক ফোঁটা লাল কালি যদি এক গ্লাস জলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়, ক্রমশঃ গ্লাসের সমস্ত জল সমানভাবে লাল হয়ে যায়—এ ব্যাপারটি কারো অবিদিত নয়। সেরূপ কয়েকটি মিশ্রির দানা এক গ্লাস জলে ফেলে দিলে অনতিবিলম্বে গ্লাসের সমস্ত জলটি সমানভাবে মিষ্টি হয়—এ কথাও সকলে জানেন। মিশ্রির দানার অণুগুলি তাদের শৃঙ্খলার বাঁধন কেটে জলের ভিতর তখন ছড়িয়ে পড়ে। জড়জগতের অন্তিম উপাদান অণুপরমাণুসমূহ সততই চঞ্চল, চারদিকে এরা শুধু ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কোন বাঁধন মেনে সহজে থাকতে চায় না। সৃষ্টির পশ্চাতে যে-সব শক্তি রয়েছে তার প্রভাবেই এরা শৃঙ্খলিত হয়ে বিবিধ বস্তুরাজির ও বিচিত্র বিশ্বের জন্ম দান করে। আমাদের শাস্ত্রেও এরূপ তত্ত্বের উল্লেখ রয়েছে সৃষ্টির বর্ণনায় ;—"অব্যক্তাৎ ব্যক্তিমাপন্নম্"। যেখানে সকল শৃঙ্খলার বিলোপ ঘটে—তা হ'ল প্রলয় বা একাকার—শূন্য ব্যোম অপরিমাণ, সুতরাং অব্যক্ত। কিন্তু জীবের বেলায় যখন দীর্ঘকালব্যাপী এ শৃঙ্খলার অবস্থা বজায় থাকে তখন একথা স্বীকার করতে হয় যে, জীবের জীবনীশক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, খাদ্য-পানীয়রূপে বাইরের জড়জগতের আণবিক সংহতির শৃঙ্খলা শোষন করে' সে জীবের জড়দেহে তা সঞ্চিত করে ;

এবং এতেই হয় জীবের জীবন রক্ষা। যতদিন যাবৎ জীবের দেহে এ জীবনীশক্তি কাজ করে, ততদিন তার জীবন। এ জীবনীশক্তি কোথা থেকে আসে, বা কোথায় যায়, এ নিয়ে এখানে আলোচনা করা চলে না। বিজ্ঞান এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে নারাজ।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে জীবনীশক্তি হচ্ছে সৃষ্টির প্রেরণা। আমরা দেখেছি যে, আধুনিক সভ্যতায় মানুষের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে উঠেছে নাগরিক জীবনযাত্রার মোহে। সুতরাং এ সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে বড় বড় সহরে কেন্দ্রীভূত না করে পল্লীজীবনে ছড়িয়ে দিতে হবে; পল্লী ও ছোট ছোট সহরগুলি সংস্কার করে তাদের সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও শিক্ষাদীক্ষায় সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী করে তুলতে হবে। মহানগরীর ও তার উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় কলকারখানার পরিবর্ত্তে পল্লীতে পল্লীতে ও ছোট ছোট সহরে পারিবারিক বা যৌথশিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কারবারের ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় মানুষকে যন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তার অন্তর্নিহিত সৃষ্টির প্রেরণাকে প্রবুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলবার সুযোগ দিতে হবে। কেননা, বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে বুদ্ধিমান মানুষ না করে কেবল বুদ্ধিমান অমানুষ করে তুলছে। যে সমাজে বা সভ্যতায় মনুষ্যত্বের গ্লানি দেখা দেয়, সে সমাজ বা সভ্যতা বেশিকাল টিকে থাকতে পারে না। ইতিহাসে এর প্রমাণের অভাব নেই। এর আলোচনায় আজ আমেরিকার বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন মগ্ন হয়ে।

আধুনিক সভ্যতার আর একটি পতনের লক্ষণ দেখা যায়, তার বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়। বড় বড় সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে, ছোট ছোট সহরের এবং পল্লীগ্রামের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর স্কুলে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বাস্তব জীবনের বিশেষ কোন সংযোগ-সম্বন্ধ নেই। এর ফলে আধুনিক যুগের ছাত্রছাত্রীর দল তোতাপাখীর মত অনেক প্রকারের বুলি আওড়াতে পাকা হয়ে ওঠে সন্দেহ নাই, কিন্তু আপন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজের সৃষ্টিশক্তি বা মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলবার ক্ষমতা হারায়।

তারা নিজের চরিত্র এবং আদর্শ গড়ে তোলে খবরের কাগজের লেখা থেকে, জনতার নেতৃবৃন্দের উত্তেজনাবহুল বাক্‌বিতণ্ডা থেকে, রেডিওর কথা থেকে, এবং চলচ্চিত্রের ছবি থেকে। তাদের মনের খোরাক জোগায় অপরে; তাই কলে গড়া পুতুলের মত একই ছাঁচে গড়ে উঠে তারা প্রায় একই বুলি বলতে থাকে; শোভাযাত্রায় দলে দলে তারা ঐক্য গান গেয়ে বেড়ায়; দলের পূজায়, মতের পূজায় এবং নেতার পূজায় তারা পাগলের মত মেতে যায়। এই কারণে আধুনিক ছাত্রমহলে মনুষ্যত্বের বা চরিত্রগঠনের মালমশলা—শ্রদ্ধা, বিনয়, শিষ্টাচার, ত্যাগ, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রায়ই অভাব দেখা যায়। বর্ত্তমান সভ্যতাকে ঊর্দ্ধগামী করে রাখতে হলে এ শিক্ষাব্যবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন আবশ্যক; এ হ'ল অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অভিমত।

ডেনমার্ক ও সুইডেনে যে-শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সমাজের দিক থেকে, মনুষ্যত্বের দিক থেকে এবং প্রকৃত ও স্থায়ী সভ্যতার দিক থেকে তাই হল তাঁদের মতে আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা। এ-সব দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ পালা করে লেখাপড়া এবং হাতের ও কলের কাজ করতে শেখে। কিছুকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার পর তারা যায় মাঠে চাষবাস করবার জন্য, কিম্বা বিবিধ শিল্পালয়ে বা কারখানায় কাজের জন্য; এর পর আবার আসে বিদ্যালয়ে এবং আবার কিছুকাল পরে যায় কৃষি, শিল্প বা অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে। এতে বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার নিবিড় সংযোগ ঘটে। ফলে দেখা যায়, সর্ব্বশেষে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তারা সবল, সুস্থ, সুদক্ষ, অর্জ্জনক্ষম, দেহে মনে সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী, চরিত্রবান এবং দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ মানুষ বা নাগরিক হয়ে ওঠে। নিজের কর্ম্মজীবনকে এবং সমাজের জীবনকে এরা সফল, সুন্দর ও সার্থক করে তোলে। ডেনমার্ক ও সুইডেনের জনসমাজে তাই বেকার সমস্যার কোন বালাই নেই; অভাব-অনটনজনিত কোন অসন্তোষ বা অশান্তির উপদ্রব নেই; নাগরিক সভ্যতার বিষাক্ত পরিণাম, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ও অর্থের শোষণ নেই। আমাদের দেশে মহাত্মাজীর

অনুমোদিত বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাও অনেকটা এ-শিক্ষা ব্যবস্থার অনুরূপ।

এ প্রসঙ্গে এখানে মহাত্মাজীর গ্রামোন্নতি বিধানের কথাও মনে পড়ে। গ্রামের ও গ্রামবাসীর উন্নতির জন্য চেষ্টা ও প্রচার ছিল তাঁর জীবনের প্রধান কাজ। তাঁর অন্তর্দ্দৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও হৃদয়ের প্রেরণা থেকে তিনি আমাদের যে-কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন, বিজ্ঞানও, বিশেষত সমাজবিজ্ঞান, আজ ঐ একই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছে। আমাদের সমাজবৃক্ষের শিকড় রয়েছে গ্রামে, যদিও তার ফুলফলের বিকাশ হয় বড় বড় মহানগরীর কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে। শিকড়ে যদি রস বা পুষ্টির অভাব ঘটে তবে গাছ যাবে শুকিয়ে বা মরে। তাই সমাজ বা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, তার তরুণ ডালে ফুল ফোটাতে ও ফল ধরাতে হ'লে, আমাদের প্রথম নজর দিতে হবে মরণোন্মুখ পল্লীর দিকে। ভিত্তি যদি মজবুত হয়. তবেই তার উপর প্রাসাদ গড়লে স্থায়ী হবে, নতুবা দম্‌কা হাওয়ার জোড় আঘাতে সে প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বে।

আমাদের আধুনিক সভ্যতায় এ-রূপ অনেক পতনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মানুষ যদি তার বিচারবুদ্ধিকে ক্ষমতা এবং অর্থের মোহ থেকে মুক্ত করে নিজেকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে, ঐক্যের পথে এবং শান্তির পথে পরিচালিত না করে, তবে এ-সভ্যতারও যে অবসান হবে, তা কিছুই বিচিত্র নয়। বিজ্ঞানচর্চ্চায় জড়শক্তির ও জড়পরমাণুর রহস্য আবিষ্কার করে মানুষ আজ, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে তার আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু আপন দেহ-মনকে এর উপযোগী করে নিজের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করতে পারেনি। বরং তার অহঙ্কার, লোভ এবং স্বার্থ এতে অপরিমিত ভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে। এরই পরিণাম হয়েছে আজ মানুষে মানুষে হানাহানি, রক্তারক্তি ও বর্ব্বরতার অভিনয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঔৎসুক্যে, মানুষের জৈবধর্ম্মের প্রেরণায়, তার বুদ্ধির মোহে, তার মতবাদে এবং তার দেহগত বৃত্তির কামনা ও অভিলাষের সমন্বয়ে আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। মানুষের প্রচেষ্টায় গড়া এ

সভ্যতা মানুষকে শান্তি দিতে পারে নি। বিজ্ঞানকর্ম্মীরা আজ দুর্গম পথে চঞ্চল চিত্তে যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। বিজ্ঞানের অফুরন্ত ধনভাণ্ডার থেকে মানুষ যে-সব দীপ্তিমান ও শক্তিমান জিনিষ বেছে নিয়েছে, তাতে তার অবিমিশ্র কল্যাণ ঘটেনি। সমাজের দিক থেকে এ নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ শুভ হয়নি। অল্প পরিশ্রমে অধিক আরাম পাবার আশায়, দ্রুতগামী যানবাহনে চলার ও আমোদের লোভে মানুষের এ নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই আমরা দেখতে পাই মোটরকার, এরোপ্লেন, সিনেমা, রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশন ইত্যাদিই আজ গণ্য হচ্ছে সভ্যতার প্রধান অঙ্গরূপে। এ সকলের উগ্র নেশায় আজ যেন পৃথিবী জুড়ে নরনারী মাতাল হয়ে উঠেছে। এ পতনোন্মুখ সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে, এ-সব যন্ত্র এবং জড়পদার্থের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হলে, মানুষকে আজ নজর দিতে হবে তার দেহ-মনের স্বাস্থ্যের দিকে। বর্ত্তমান সভ্যতার আবহাওয়ায় আজ মানুষের বুদ্ধিবিচারের, নীতির ও দেহের স্বাস্থ্যের যে জড়তা এসেছে, তা থেকে তাকে উদ্ধার করতে হবে। অতিকায় কারখানার শ্রেণী, অভ্রভেদী প্রাসাদরাজি, নির্ম্মম মহানগরী, অর্থতান্ত্রিক বেণে নীতি, ভোগবিলাসের উপকরণের অপরিমিত উৎপাদন যদি সভ্যতার একমাত্র অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, তবে সে সভ্যতার পরিণাম যে ভয়াবহ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সংস্কৃতির সঙ্গে যেখানে আরামের মোহ নেই, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কলঙ্ক নেই, যন্ত্রের সঙ্গে কারখানার দাসত্ব নেই, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিলাস নেই, সহযোগিতায় স্বাতন্ত্র্যের অভাব নেই, এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরোধ নেই, সে সমাজ এবং সভ্যতাই হবে মানুষের পক্ষে উপযোগী। তাতেই সম্ভব হবে মনুষ্যত্বের বা তার অভিব্যক্তির চরম বিকাশ।

বৈজ্ঞানিক সত্য

সত্য এবং জ্ঞান অন্বেষণের দুটি পন্থা আবহমান কাল হতে মানুষের সমাজে চলে আসছে। একটি হল দেখাশুনা, অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধিযোগে ইন্দ্রিয়ানুভূতির, এবং অপরটি হল ধ্যানধারণালব্ধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ধারা। প্রথমটিকে বলা যায় বিজ্ঞানের, এবং দ্বিতীয়টিকে বলা যায় অধ্যাত্মবিদ্যার পথ। শোনা যায়, মহাজন বা মহাপুরুষেরা ধ্যানধারণার ফলে অখণ্ড সত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে। অন্ধকারে আলোর মত অখণ্ড সত্যের রূপ বা পরম জ্ঞানের জ্যোতি ফুটে ওঠে তাঁদের মানসপটে। এর ধারণা কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবিচারের অধীন নয়। কেননা, এর সন্ধান পেলে মানুষের পক্ষে আর অন্য কিছু পাবার বাকী থাকে না—যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ; এবং এ জানলে মানুষের আর কিছু জানবার বাকী থাকে না—যজ্ জ্ঞাত্বা নেহভূয়োন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ অখণ্ড সত্যের বা পরম জ্ঞানের অনুভূতি সম্ভব নয়; তাই মানুষ চলেছে বিজ্ঞানের পথে সত্য এবং জ্ঞানের সন্ধানে। এ বৈজ্ঞানিক সত্য বা জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হচ্ছে বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য।

লোকে কথায় বলে বৈজ্ঞানিক সত্য—অর্থাৎ যেন একেবারে খাঁটি সত্য, যার মধ্যে কোন ভেজাল নেই। কিন্তু বিচারে দেখা যায়—বৈজ্ঞানিক সত্যমাত্রই হচ্ছে আংশিক বা খণ্ড সত্য। এদের স্বরূপ বদলায় অহরহ, নিত্যনূতন আবিষ্কারে। সুতরাং বিজ্ঞানে যে সত্যের বিবরণ আমরা পাই, তা হচ্ছে কতকটা অন্ধের হস্তীদর্শনবর্ণনার অনুরূপ। বিজ্ঞানে সত্যের কারবার চলছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা যন্ত্রযোগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সাহায্যে। চোখের অদৃশ্য সূক্ষ্মবস্তুকে বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানুষ দেখতে পায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রে; কোটী কোটী যোজন

দূরবর্তী নীহারিকার অভ্যন্তরপ্রদেশ জরীপ করছে সে দূরবীণের কৃপায়। পৃথিবীর অপর প্রান্তের শব্দ এবং দৃশ্য মানুষ শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছে রেডিও, টেলিফোন এবং টেলিভিশন যন্ত্রের আবিষ্কারে। এ-সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ হতে বিজ্ঞান গড়ে তুলেছে এক একটি খণ্ড সত্য। এ-সব খণ্ড সত্যকে কার্যকারণের সূত্রে গেঁথে বিজ্ঞানের প্রয়াস চলছে পরমসত্যের সন্ধানে। কিন্তু যতই এ-সব নিত্যনূতন খণ্ডসত্যের আবিষ্কার হচ্ছে, বিজ্ঞানের অজানা রাজ্যের পরিধিও ততই যাচ্ছে বেড়ে। ফলে, কোন কালে যে বিজ্ঞান পরমসত্যের নাগাল পাবে, এ দুরাশা করা চলে না। কবির কথায় বলা যায় বিজ্ঞানের পক্ষে "জ্ঞানের সীমানা নাই কোথা ; চারিদিকে যতই সে পথ খুঁজে ফিরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে যায়।"

পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন এর কারণ কি ? এক কথায় বলতে হলে কারণ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সীমাবদ্ধ শক্তিতে। যখন অপূর্বশক্তিশালী উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যেও কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়াকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির জালের মধ্যে ধরতে পারি না, সেখানেই নেয় বিজ্ঞান কল্পনার আশ্রয় এবং সেখানেই মানে সে হার। কাজেই কার্যকারণের সকল গ্রন্থির সন্ধান বিজ্ঞান পায় না। তা ছাড়া, কার্যকারণের সূত্রাবলম্বনে যে বিচার, তার কোন আদি-অন্তের নির্দেশ পাওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞান তার এ অজ্ঞানকে প্রকৃতি বা nature এর দোহাই দিয়ে চালাতে চায়। আসলে, দেশ এবং কালের মধ্যে বাঁধা রয়েছে বিজ্ঞানের জ্ঞান। কিন্তু কালের কোন আদি অন্ত মধ্য নেই, একথা বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সবাইকে স্বীকার করতে হবে। সুতরাং কালের গতির সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে গাঁথা বিজ্ঞানের সত্যেরও কোন পরিণাম বা অন্ত নেই। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এ কারণে সিদ্ধান্ত করেছেন কাল বলে কোন সত্তা নেই—এ হচ্ছে ঘটনাবলীর পারম্পর্য নির্ণয়ের জন্য মানুষের উদ্ভাবিত কৌশল মাত্র। কেননা, ভূত ভবিষ্যৎ ও অতীত বলে যে আমরা কালের বিভাগ করে থাকি, তা সকলের নিকট সমান নয়। একথা প্রমাণ করেছেন আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদে। আইনষ্টাইনের গবেষণার ফলে দেশের সত্তাও

গেছে এভাবে বিলোপ হয়ে। ফলে দাঁড়ায়, দেশকালের ভিত্তিতে গড়া বিজ্ঞান কোন চরম বা সনাতন অখণ্ড সত্যের সন্ধান আমাদের দিতে পারে না।

তথাপি বিজ্ঞান তার খণ্ডসত্যগুলিকে জুড়ে এক অখণ্ড সত্যের সন্ধান করতে যেয়ে যে সিদ্ধান্তে এসেছে, তাকে চলতি কথায় প্রকাশ করতে হলে 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মেহের আলির ভাষায় বলতে হয়—'সব ঝুটা হ্যায়'; অর্থাৎ যা আমরা আমাদের চারদিকে দেখতে বা শুনতে পাই, সে সবই ভেল্কিবাজী। এ শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ অনুভূতিশক্তির কারসাজী। নানাবর্ণে সমাকুল আমাদের এ বিচিত্র বিশ্ব হচ্ছে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে শুধু কতগুলি তেজতরঙ্গের লীলাখেলা। লাল, নীল, পীত, হরিৎ, বেগুনি প্রভৃতি নানা রংএর অনুভূতি আমরা পাই বিভিন্ন কম্পনসংখ্যার তেজতরঙ্গের সঙ্গে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সংযোগ হতে। যাকে আমরা কঠিন নিরেট লোহা বলে গণ্য করি, তা হচ্ছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একেবারেই ফাঁপা এবং অসংখ্য রন্ধ্রে পরিপূর্ণ। একটি লৌহপিণ্ডের অভ্যন্তরে সংখ্যাতীত অণুপরমাণু অবস্থান করে। এরা কখনো স্থির থাকে না, নিজ নিজ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অহরহ অল্প-বিস্তর স্পন্দনশীল। কিন্তু এ-সব অণুপরমাণুগুলি আবার ইলেক্ট্রণ, প্রোটণ ও নিউট্রণের সমবায়ে গঠিত। লৌহপিণ্ডে প্রত্যেকটি অণুপরমাণু যে পরিমাণ স্থান জুড়ে থাকে, তার তুলনায় তাদের উপাদান ইলেক্ট্রণ প্রোটণ প্রভৃতির স্থান হচ্ছে এক প্রকার নগণ্য। অর্থাৎ লৌহপিণ্ডের অভ্যন্তরপ্রদেশে ইলেক্ট্রণ প্রোটণ ইত্যাদির পরস্পর দূরত্ব তাদের আপন আয়তনের হাজার গুণেরও অধিক বলা যায়। মোটের উপর লৌহপিণ্ডটি হচ্ছে অসংখ্য অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রন্ধ্রে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইলেক্ট্রণগুলি প্রোটণ-নিউট্রণে গঠিত পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর চতুর্দিকে এমন প্রচণ্ডবেগে ছুটে বেড়াচ্ছে যে, তাতে মনে হয় সমস্ত ফাঁকা জায়গা যেন তারাই রয়েছে অধিকার করে। অণুপরমাণুর অভ্যন্তরে এ-সব ইলেক্ট্রণের গতিবেগের মাত্রা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬০।৭০ মাইলেরও অধিক। এত বেগে এরা ছুটোছুটি করে যে পরমাণুর অভ্যন্তরে কোন মুহূর্তে কোথায় তাদের অবস্থান তা নির্দেশ করা অসম্ভব। এ কারণে

বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ প্রচার করেছেন তাঁর অনিশ্চিততাবাদের ; এবং বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিঙ্গার ইলেক্ট্রণকে তরঙ্গকম্পনে পরিণত করে তার জড়ত্বকে দিয়েছেন একেবারে উড়িয়ে। আবার কোন কোন বিজ্ঞানী ইলেক্ট্রণকে বাষ্পীভূত করে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত পরমাণুদেহে মেঘের আকারে। কিন্তু, পাঠক যদি এখন প্রশ্ন করেন, কার তরঙ্গ বা কোন পদার্থের মেঘ, তা'হলে বিজ্ঞানী এর কোন উত্তর দিতে পারবে না।

অন্যদিকে যদি আমরা আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ, কিম্বা সৌরজগতের বা বিশাল নক্ষত্রলোকের গতিবিধি নিয়ে বিচার করতে বসি, তাতেও দেখা যায় যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌরজগৎ বা নক্ষত্রলোকের সঙ্গে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের কোন সাদৃশ্য নেই। যে ধরাপৃষ্ঠে অমারা স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করি, যাকে আমরা স্থির এবং অচঞ্চল মনে করে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই, বিজ্ঞানের প্রমাণে সে ভূমণ্ডল এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারে না। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে যে অসাধারণ বেগে আমাদের পৃথিবী ছুটে চলে, তার কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের গণনায় পৃথিবীর এ চক্রাকার গতিবেগের পরিমাণ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ মাইল। মানুষের গড়া আণবিকশক্তিতে পরিচালিত সবচেয়ে দ্রুতগামী যানবাহন বা রকেটের বেগও এর কাছে যায় হার মেনে। অথচ, ধরাপৃষ্ঠে বাস করেও এরূপ অসাধারণ বেগের কোন অনুভূতিই আমরা পাই না। এর উপর বিজ্ঞানের প্রমাণে পৃথিবী আবার নিজের অক্ষদণ্ডের উপর লাটিমের মত খাচ্ছে অনবরত চক্রপাক। এ ঘূর্ণিপাকের গতিবেগও মিনিটে প্রায় ১৬।১৭ মাইলের উপর। এও আমরা কোন কালে অনুভব করতে পারি না। পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে বিজ্ঞানের এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণ কি ? উত্তরে বলতে হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে, দিনরাত, শীতগ্রীষ্ম ইত্যাদি নৈসর্গিক পরিবর্তনের সহজে ব্যাখ্যা করা চলে না। পাঠক হয়ত আবার প্রশ্ন করবেন, এর কোন অনুভূতি আমাদের হয় না কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আইনষ্টাইন তাঁর অপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে। তিনি প্রমাণ দিয়েছেন

যে আমাদের স্থিতিগতির অনুভূতি হচ্ছে সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। পরমস্থিতি বা পরমগতির কোন ধারণা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। উড়ো-জাহাজে যাঁরা যাতয়াত করেন, এ কথার তাৎপর্য্য তাঁরা কতকটা বুঝতে পারবেন। সাধারণতঃ এরোপ্লেন চলে ঘণ্টায় মাত্র ২০০-২৫০ মাইল বেগে; তথাপি এরোপ্লেনে চাপলে মনে হয় যেন স্থির হয়ে ঘরে বসে আছি। এরোপ্লেনের চলার কোন লক্ষণ দেখা যায় না, যতক্ষণ না আমরা নীচে তাকিয়ে দেখি যে নদী, পাহাড়, সহর, গ্রাম প্রভৃতি সব যাচ্ছে পিছনে সরে। মনে হয় আরো, এরোপ্লেনটা আছে যেন শূন্যাকাশে স্থির হয়ে, এবং তলায় পৃথিবীটা চলেছে উল্টো দিকে। যখন এরোপ্লেনটা উঠতে বা নামতে থাকে অথবা যখন তার গতিবেগ বাড়তে বা কমতে থাকে, তখন আমরা এরোপ্লেনের এ চলাচল অনুভব করতে পারি। যেখানে বিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩০ মাইল, সে ক্ষেত্রে এরোপ্লেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ২০০-২৫০ মাইল বললে তার শুধু আপেক্ষিক গতিই বোঝায়। নিরপেক্ষভাবে এরোপ্লেনের গতিবেগ হিসাব করতে হলে পৃথিবীর গতিবেগের সঙ্গে তার আপন গতিবেগ যোগ বা বিয়োগ দিতে হয়। কিন্তু এখানেও রেহাই নেই। কেন না, পৃথিবীর গতিও বিজ্ঞানের মতে আপেক্ষিক; কারণ সমস্ত সৌরজগতের আবার একটি গতি আছে। এরূপে বিজ্ঞানের কোনো খণ্ডসত্যকেও খাঁটি বা নিরপেক্ষ সত্য বলে গণ্য করা চলে না।

ফলে দাঁড়ায় মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে, বিজ্ঞান যে বিশ্বরূপের সন্ধান দেয় তার কোন মিল নেই। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগতকে বিশ্লেষণ করে যে অখণ্ডসত্যের বা জ্ঞানের আবিষ্কারে বিজ্ঞান অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে, তাতে রূপে-রসে-গন্ধে-ভরা স্থির ও অচঞ্চল প্রতিদিনকার ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব যাচ্ছে বাতিল হয়ে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গড়া একটি অপরূপ মায়া, সুতরাং এক প্রকার অসৎ এবং অনিত্য। বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগে হয় এর সৃষ্টি। এ কারণে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও সীমার সঙ্গে এর রূপ যায় বদলে। রং-কাণা লোকের কাছে বিশ্বজগৎ দেখা দেয় বর্ণবৈচিত্র্যবিহীন

হয়ে। মানুষেতর জীবের নিকট, অর্থাৎ পশুপক্ষীর দৃষ্টিতে এ জগৎ হবে ভিন্ন রকম। পিপীলিকা ও সরীসৃপ প্রভৃতি জীবের কাছে এ হয়ত দেখা যায় আরো স্বতন্ত্র রূপে। এখানে বিজ্ঞানের মায়াবাদের সঙ্গে বেদান্তের মায়াবাদের তুলনা চলে।

বিজ্ঞানের প্রমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ মায়াময় হলেও, বিজ্ঞানের কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎকেও চরমসত্য হিসাবে গণ্য করা চলে না। কারণ, বিজ্ঞানের জগৎ হচ্ছে শুধু খণ্ডসত্যের জোড়াতালি; এবং পরিশেষে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ইলেক্ট্রণ ও তেজতরঙ্গের অগাধ জলে গেছে তলিয়ে। অনিশ্চিততাবাদের প্রতিষ্ঠা করে এ ক্ষেত্রে সে আপনার হার নিয়েছে স্বীকার করে। বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা যন্ত্রযোগে লব্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিশ্লেষণ। যেখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতিমাত্রই হচ্ছে ভঙ্গুর এবং ভ্রমাত্মক, সে-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকেও পরম বা সনাতন সত্য বলে গণ্য করা চলে না। এ শুধু, এক প্রকার মায়া হতে আর এক প্রকার মায়ার প্রকাশ-বিশেষ।

উপসংহারে বলা যায়, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিত্তিতে গড়া বিজ্ঞানের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বজগৎ শুধু খণ্ডসত্যেরই পরিচয় দিতে পারে। এ-সব খণ্ডসত্যকে জুড়ে অখণ্ড সত্যের আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই তার অজ্ঞানের পরিধি গেছে বেড়ে। তাই ব্যবহারিক জগতে অক্ষুণ্ণ ও অভাবনীয় প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা করেও পরমসত্যের ধারণায় বিজ্ঞান মেনেছে হার। ইন্দ্রিয়ানুভূতিসাপেক্ষ একমাত্র জড়বস্তুর বিশ্লেষণে পরমসত্যের সন্ধান কখনো মিলবে না। তাই বলতে হয়, ধর্মের মত সত্যের তত্ত্বও রয়েছে গুহার মধ্যে নিহিত; অতএব মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। এ পথ হচ্ছে, যা গোড়ায় বলা গেছে, সাধারণের অনধিগম্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পথ। এ অনুভূতিতে মানুষের বুদ্ধি ও বিজ্ঞান পায় লয়। তাই একে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে 'অবাঙ্ মনসোগোচরঃ'।

বিজ্ঞানের বিভীষিকা—পরমাণু বোমা

এটম বোমার নাম শোনেনি এমন ব্যক্তি আধুনিক সভ্যসমাজে খুব কমই আছে। কিন্তু এটম বলতে আসলে কি বোঝায়, এবং তা হ'তে কি করে এমন ভীষণ মারণ-যন্ত্রের সৃষ্টি হয়, এ খবর হয়ত অনেকে রাখেন না। কৌতূহলী পাঠকবর্গের পরিতোষের জন্য এ সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা এখানে সহজ ভাষায় বলতে চাই।

অণুপরমাণু শব্দ দু'টি বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী সবার কাছেই অত্যন্ত পুরাণো হয়ে গেছে। এক সময়ে এরা ছিল বিজ্ঞানীদের অনুমান কল্পনার সৃষ্টি। যা কিছু মানুষ চোখে দেখেছে, কাণে শুনেছে, স্পর্শের সাহায্যে বা ঘ্রাণে অনুভব করেছে, তাদের কারণ নির্ণয়ের এবং তাদের অন্তরালে বা পশ্চাতে কি রয়েছে তা জানবার প্রচেষ্টায় হয়েছিল অণুপরমাণুর কল্পনা। এ কল্পনার সাহায্যে যাবতীয় পদার্থের ধর্মের ব্যাখ্যা হয়ে উঠেছিল সহজ; এবং একেই কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের বিচিত্র সৌধ উঠেছিল গড়ে। কোন বাড়ী যেমন নিরেট, অতিকায়, ছাঁচে গড়া পোড়ামাটির ঢিপি নয়,—একটি একটি করে ইটের সঙ্গে ইট গেঁথে হয় এর গঠন, সেরূপ বিশ্বজগতের বস্তুসমূহ—সজীব, নির্জীব, স্থাবর, জঙ্গম—কোনটিই এক একটি নিরেট পিণ্ড নয়। অণুপরমাণুর সমবায় হতেই তাদের উৎপত্তি। কিন্তু বহুকাল যাবৎ বিজ্ঞানীরা এ সব অণু-পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষীভূত বা যন্ত্রলব্ধ প্রমাণ দিতে পারেন নি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এ সব অণু-পরমাণুর বাস্তব সত্তার অনেক প্রমাণের আবিষ্কার হ'ল বটে, কিন্তু তথাপি তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল তখনও কাল্পনিক। পরমাণুকে মনে করা হতো নিরেট, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, নিত্য, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, সনাতন সত্তা। এদের সৃষ্টি বা বিলোপ ঘটতে পারে না। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করলেন, পরমাণুর সমষ্টি মিলে অণুর, এবং অণুর সমষ্টিতে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ সব অণুপরমাণুর আয়তন এবং ওজন পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করেছেন। এরা যে কত সূক্ষ্ম তার ধারণা করতে হলে উপমার সাহায্য নিতে হয়। কেননা, এদের চোখে দেখা

যায় না, এমন কি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও নয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা রঞ্জন রশ্মি ও ইলেক্ট্রণ রশ্মির সাহায্যে এদের অবস্থান ও আয়তনের খবর চিত্রযোগে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তা হতে তাদের স্বরূপের কোন বাস্তব ধারণা করা সম্ভব নয়। অণু-পরমাণুর আয়তন এত ক্ষুদ্র যে তাদের ব্যাসের পরিমাপ হবে এক ইঞ্চির বিশ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। একটি ফুটবলের আকারের লৌহপিণ্ডকে যদি পৃথিবীর আকারের সমান করে বাড়ান যায়, তবে তার এক একটি পরমাণুর আকার হবে ফুটবলের আয়তনের সমান। গণনায় দেখা যায় যে এক আউন্স পরিমাণ জলে ৫×১০^{২৩} বা ৫০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক জলের অণু অবস্থিতি করে। তথাপি এদের পরস্পরের মধ্যে বিস্তর ফাঁক থেকে যায়। অণুগুলি এই এক আউন্স পরিমিত স্থানের ভিতর তাই প্রচণ্ড বেগে ছুটোছুটি করে; ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে অহরহ সংঘর্ষ ঘটে। এক আউন্স জলের ওজন হচ্ছে আড়াই তোলা। সুতরাং এক একটি জলের অণুর ওজন হবে ০.৫×১০^{-২৩} বা ০.০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০৫ তোলা; অর্থাৎ ২এর পিঠে ২৩টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয়, এক তোলার তত ভাগের এক ভাগ। এ সম্বন্ধে আরো একটি সুন্দর উপমা দেওয়া যায়। গণনায় দেখা যায় এক ঘন আয়তন ইঞ্চি পরিমিত স্থানে কোটি কোটি হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন গ্যাসের অণু অবস্থান করতে পারে। অণু মাত্রই অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির, বিশেষতঃ গ্যাসের বা অন্য কোন মারুত পদার্থের। ঐ ক্ষুদ্র-পরিসর স্থানে কোটি কোটি গ্যাসের অণু ভীষণ বেগে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুমান করা যাক, কোনো গ্যাসে ভর্তি এরূপ এক ঘনায়তন ইঞ্চি পরিমিত স্থানকে এত গুণ বিবর্দ্ধিত করা হল যে তার এক একটি অণুর আকার হয়ে গেল এক একটি কমলা লেবুর সমান। এখন দশ হাজার মজুর লাগান হল এসব কমলালেবুর আকারের প্রত্যেক অণুটিকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে সরিয়ে রাখবার জন্য; যেমন আমরা এক ঘর হতে অন্য ঘরে জিনিষপত্রাদি সরিয়ে রাখি। প্রত্যেক মজুর যদি

প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে অণু এভাবে সরিয়ে রাখে, তাহলে দিবারাত্রি অবিরাম পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাদের বিশ কোটি বছর লাগবে একাজ শেষ করতে। অণুগুলি যে কত ছোট, এ হতে তার ধারণা করা যায়। দুই বা বহু পরমাণু মিলে যখন সাধারণতঃ এক একটি অণুর সৃষ্টি করে তখন অণু হতেও পরমাণু হচ্ছে সূক্ষ্মতর। ৯২ প্রকার বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার সংযোগ-সংহতির ফলে যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি ঘটেছে, এ হচ্ছে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণ হল যে, পরমাণুগুলি নিরেট বা অখণ্ড নয়। তাদের ভেঙ্গেচুরে আরো ছোট ছোট সত্তার উৎপত্তি করা যায়। পরমাণু ভেঙ্গে প্রথমে বেরুল ইলেক্ট্রণ। এরা হল বিয়োগধর্মী তাড়িতকণা। এদের ওজন এবং আকারও গেল নির্ণয় করা। দেখা গেল এক একটি ইলেক্ট্রণের ওজন হচ্ছে এক একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের ১৮৫০ ভাগের এক ভাগ। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু হচ্ছে সবচেয়ে হাল্কা। আমরা দেখেছি এক একটি জলের অণুর ওজন হচ্ছে ৫×১০^{-২৪} তোলা। একটি হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর ওজন আবার জলের অণুর ১৮ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রায় ৩×১০^{-২৫} তোলা। সুতরাং এক একটি ইলেক্ট্রণের ওজন হবে প্রায় ১৫×১০^{-২৯} তোলা; অর্থাৎ ০.০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০, ০০০, ০১৫ তোলা। পাঠক পাঠিকা এর ধারণা করতে পারেন কি? এক একটি ইলেক্ট্রণের ব্যাস হচ্ছে আমাদের মাথার এক একটি চুলের ব্যাসের হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। শুধু ইলেক্ট্রণ দিয়ে পরমাণুর সৃষ্টি হতে পারে না। পরীক্ষার ফলে প্রমাণ হল যে আরো দু'রকমের কণিকা জুড়ে এক একটি পরমাণুর সৃষ্টি হয়েছে। এ দুটির নাম হচ্ছে প্রোটণ এবং নিউট্রণ। ওজনে এরা হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। এদের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে প্রোটণের সঙ্গে থাকে যোগধর্মী তাড়িতের সংযোগ; নিউট্রণে এরূপ কোন তাড়িতের বোঝা নাই। নিউট্রণকণিকা হ'তে যদি একটি ইলেক্ট্রণ বের করে নেওয়া

যায়, তবে তা বদলে যাবে প্রোটণ হয়ে। সেরূপ প্রোটণের সঙ্গে যদি একটি ইলেক্ট্রণ দেওয়া যায় জুড়ে তেমনি তাও বদলে যাবে নিউট্রণে। অথবা নিউট্রণের সঙ্গে যদি একটি পজিট্রন যায় জুড়ে তবে নিউট্রটিণ যাবে প্রোটণ হয়ে। পজিট্রণ হচ্ছে যোগধর্মী তাড়িতকণা, ইলেক্ট্রণের সমকক্ষ। এর ওজন এবং আয়তন ইলেক্ট্রণের সমান। বিজ্ঞানীরা পজিট্রণের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন বেশি দিন হয়নি। এর আবিষ্কার হয় ১৯৩২-৩৩ খৃঃ অব্দে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরমাণু মোটেই নিরেট বা অখণ্ড নহে। পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে প্রত্যেক পরমাণুর একটি কেন্দ্রবস্তু আছে, যার চতুষ্পার্শ্বে বৃত্ত ও উপবৃত্তাকারে অহরহ এক বা বহু ইলেক্ট্রণ ঘুরপাক খাচ্ছে। পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুটির সৃষ্টি হয়েছে প্রোটণ এবং নিউট্রণের ঘন সমাবেশে। পরমাণুর ভর বা ওজন আসে এ কেন্দ্রবস্তু হতে। কেন্দ্রবস্তুর ওজনের তুলনায় ইলেক্ট্রণের ওজন নগণ্য বললেই হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে কেন্দ্রবস্তুর আয়তন হচ্ছে ইলেক্ট্রণের আয়তন হতে বহুগুণে ছোট। কেন্দ্রস্থ প্রোটণের সমান সংখ্যক ইলেক্ট্রণ কেন্দ্রবস্তুর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। ফলে, যোগধর্মী এবং বিয়োগধর্মী তাড়িতের মাত্রার তুল্যতায় পরমাণুতে তাড়িতধর্মের কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ইলেক্ট্রণগুলি বিভিন্ন দূরত্বে নিজ নিজ কক্ষে কেন্দ্রবস্তুর চতুষ্পার্শ্বে প্রবল বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আয়তনে একটি ইলেক্ট্রণ হচ্ছে সমগ্র পরমাণুর আয়তনের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সমান। এর ব্যাস হচ্ছে সমগ্র পরমাণুরব্যাসের পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। আবার একটি প্রোটণ আয়তনে ইলেক্ট্রণ হতে অনেক ছোট। কিন্তু আমরা দেখেছি যে ওজনে প্রোটণ হচ্ছে ইলেক্ট্রন হতে ১৮৫০ গুণ ভারী। আয়তনে আবার ইলেক্ট্রণ হচ্ছে প্রোটণের দুই হাজার গুণ বড়।

পূর্বে বলা হল যে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু হচ্ছে প্রোটণ নিউট্রণের সমষ্টি। কেবল মাত্র হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুকেন্দ্রে কোন নিউট্রণ নেই। একক প্রোটণই হচ্ছে হাউড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু। এই একটিমাত্র প্রোটণের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটিমাত্র ইলেক্ট্রণ। এই

হল হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন এবং অবয়ব। এদের মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব হচ্ছে তাদের আয়তনের তুলনায় বহু হাজার গুণ অধিক। এর ধারণা করতে হলে আবার একটি কাল্পনিক চিত্রের সাহায্য নিতে হয়। যদি কেন্দ্রীয় প্রোটণের আয়তন হয় একটি মটরের আয়তনের সমান, তবে ইলেক্ট্রণের ব্যাস হবে প্রায় ৩০ ফিট, এবং ৩০০ মাইল দূরত্ব হতে প্রোটণকে কেন্দ্র করে এ চক্রপথে ঘুরে বেড়াবে। বলা যেতে পারে যে, যদি মটরের আকারের প্রোটণটি থাকে কলিকাতায় রাজ্যপালের প্রাসাদে, তবে ইলেক্ট্রণটি ঘুরবে পাটনার মত কোন দূরস্থ সহরের পরিধিতে। ইলেক্ট্রণের এ ঘূর্নিবেগের কোন ধারণা করা চলে না। এ বেগ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ মাইল। পরমাণুর ব্যূহ হতে যদি কোনো কারণে ইলেক্ট্রণ ছুটে পালায় তবে পৃথিবী ছেড়ে চন্দ্রগ্রহে উপস্থিত হতে তার লাগবে মাত্র তিন সেকেণ্ড, অবশ্য পথে যদি কোন বাধা না পায়। কিন্তু তাদের গতিপথে বিপুল বাধা আসে অণু-পরমাণুর আবরণ হতে। ফলে দু'এক ফুট পথ চলার আগেই তাদের এ অসাধারণ গতি যায় সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে। উপরের উপমা হতে আমরা দেখতে পাই যে পরমাণুর অভ্যন্তরটি হচ্ছে একেবারে ফাঁপা।

আমরা দেখেছি যে হাইড্রোজেন পরমাণু হচ্ছে সবচেয়ে হাল্কা; সুতরাং তার গঠনও হচ্ছে খুব সরল। কিন্তু পরমাণুর গুরুত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের গঠনপ্রণালীও জটিল হয়ে উঠে। ইউরেনিয়াম ধাতুর পরমাণু হচ্ছে সবচেয়ে ভারী। হাইড্রোজেনের পরমাণু হতে এ প্রায় ২৩৮ গুণ ভারী। ৯২টি প্রোটণ ও প্রায় ১৪৬টি নিউট্রণের সংহতি হতে এর কেন্দ্রবস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। সম তাড়িত-ধর্মী বহু প্রোটণ একত্রে জড়ীভূত হলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণের শক্তি ওঠে প্রবল হয়ে। নিউট্রণ-প্রোটণের বাঁধন যায় তখন শিথিল হয়ে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুও এ কারণে কথঞ্চিৎ ভঙ্গুর এবং অপ্রতিষ্ঠ। ফলে ইউরেনিয়াম হচ্ছে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ। তা হতে তাই অনবরত তেজরশ্মি এবং দুই প্রকারের ক্ষুদ্র কণিকা বিনির্গত হচ্ছে। এ-সব সূক্ষ্ম কণিকা-গুলিকে বলা হয় আল্‌ফা এবং বিটা রশ্মি। আল্‌ফা রশ্মি হচ্ছে হিলিয়াম

গ্যাসের কেন্দ্রবস্তু—ছুটি প্রোটণ ও ছুটি নিউট্রণের সমষ্টি। বিটা রশ্মি হচ্ছে আমাদের পরিচিত ইলেক্ট্রণ।

ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর বাঁধন শিথিল হওয়ায় তাকে ভেঙ্গে ছুই বা বহু বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুতে পরিণত করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এর উপায় বেরিয়েছে ইউরেনিয়াম ধাতু বা ইউরেনিয়াম ঘটিত পদার্থের উপর নিউট্রণ-কণিকার গুলি বর্ষণ করে। ইউরেনিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রের সঙ্গে যখন নিউট্রণ-কণিকার সংঘর্ষ এবং সংযোগ ঘটে, তখন কোন কোন ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র যায় ছুই বা বহু খণ্ডে বিছিন্ন হয়ে। এ-সব ভগ্ন খণ্ডগুলি যায় অন্যবিধ পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে হুবহু মিলে। অতএব বলা যায় যে এভাবে ইউরেনিয়ামের পরমাণু ভেঙ্গে ছুই বা বহু বিভিন্ন রকমের পরমাণুর সৃষ্টি হয়। এরূপ ভাঙ্গনপ্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটে। এ শক্তিকেই বিজ্ঞানীরা কাজে বা অকাজে লাগিয়েছেন পরমাণু-বোমার গঠন করে।

পাঠকপাঠিকা হয়ত জানতে চাইবেন ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায় এ অপরিমেয় শক্তির উদ্ভব হয় কোথা হতে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ইউরেনিয়ামের যে সব পরমাণুকেন্দ্র এভাবে নিউট্রণের আঘাতে ভেঙ্গে যায়, তাদের সকল ভগ্নাংশের বস্তুভারের সমষ্টি হয় ইউ-রেনিয়াম পরমাণুর বস্তুভারের চেয়ে কথঞ্চিৎ কম। অতএব বলা যায় যে এ ভাঙ্গনপ্রক্রিয়ার সময় বস্তুভারের ঐ ঘাটতিটুকু যায় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মহামতি আইনষ্টাইন গণনার সাহায্যে জড় ও শক্তির মধ্যে এরূপ পরস্পর রূপান্তরের পরিমাণমূলক সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। এ হতে দেখা যায় যে অতি নগণ্য পরিমাণ বস্তুভারের বিলোপে অপরিমেয় শক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক পাউণ্ড ওজনের কোন বস্তুবিশেষকে—বালি, মাটি বা জল —যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে পরিণত করা যায়, তবে তার পরিমাণ হবে দশ লক্ষ টন ডিনামাইটের বিস্ফোরণের শক্তির সমান। ইউরেনিয়ামের ভাঙ্গনপ্রক্রিয়ায় বস্তুভারের যে সামান্য ঘাটতি ঘটে, তাই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করে পরমাণুবোমার প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ।

সম্প্রতি আর এক প্রকার পরমাণু-বোমার সৃষ্টিকল্পে বিজ্ঞানীরা গেছেন মেতে। ইউরেনিয়ামঘটিত পরমাণু-বোমার শক্তি আসে পরমাণুকেন্দ্রের ভাঙ্গনপ্রক্রিয়া হতে। অন্যদিকে পরমাণুকেন্দ্রের গঠনপ্রক্রিয়াতেও এভাবে প্রচণ্ড শক্তির উৎপত্তি ঘটতে পারে। প্রচণ্ড তাপে হাইড্রোজেনের পরমাণুকেন্দ্র পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হিলিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রের সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রেও বস্তুসমষ্টির যে কথঞ্চিৎ হ্রাস ঘটবে তা গণনায় প্রমাণ করা যায়। এ বিলুপ্ত বস্তুভারের বিনিময়ে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব এবং বিকিরণ হবে সম্ভব। তাই হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টিই হচ্ছে বর্তমানে বিজ্ঞানীদের একটি গুরুতর সমস্যা। বিশ্ববাসী স্বস্ত্রস্ত হউন। রুদ্রদেব বিষাণ হস্তে শক্তির আবাহনে উদ্যত। আশঙ্কার কালো মেঘে আকাশ গেছে ঢেকে। প্রলয় এবং সৃষ্টি উভয়েরই মূলে রয়েছে শক্তি। শান্তিপ্রয়াসী নরনারী শক্তির আরাধনায় এবং পূজায় তৎপর হয়ে যোগদান করুন। রুদ্রদেব পরিতুষ্ট হউন।

বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি

একান্ত ও নিরপেক্ষ বিজ্ঞানচর্চ্চায় পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা হতে পারে কিনা,—এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক এবং বিতর্কের বিষয়। বর্ত্তমান যুগের একজন বিখ্যাত চিন্তানায়কের মতে "মানবসমাজের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মুক্তিমূলক উন্নত অবস্থায় উপনীত হবার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে আছে যুদ্ধের অনুষ্ঠানে, আয়োজনে ও আতঙ্কে।" এ কথা বিনা তর্কে মানতে হবে। ইহাও অস্বীকার করা চলে না যে বিজ্ঞানের সহায়তা ও বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের পরিচালনা ও প্রস্তুতি হোত অসম্ভব। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী আগে টলষ্টয় লিখে গেছেন "সমাজের বিধি ব্যবস্থা যদি আজ অকল্যাণকর হয়ে উঠে থাকে যার ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে এসেছে সংখ্যাবহুলের উপর পীড়ন করবার ক্ষমতা, তবে এ অবস্থায় প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাবার প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই শুধু এ উৎপীড়নের ক্ষমতাকে

তুলবে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে। ঘটনায় আজ ইহাই ঘটছে।" এ কথাগুলি যদিও টলষ্টয়ের কালের উপযোগী মনে করে বলা হয়েছিল, আজ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব অগ্রগতির বা ভয়াবহ পরমাণুবোমার যুগেও এদের গুরুত্ব উঠেছে বহুগুণ বেড়ে। বর্ত্তমানে মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের এত বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে এত বিভিন্ন প্রকারে প্রয়োগবিজ্ঞানের সংযোগ ঘটেছে যে এর প্রবল প্রভাবে বিপুল শক্তির অধিকারী হয়েছে সমাজের শীর্ষস্থানীয় অল্পসংখ্যক লোক। কথায় বলে, সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি এবং মন্দের বীজের বাহন হচ্ছে অসংযত ক্ষমতা! তাই কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলের হাতে যদি প্রচুর ক্ষমতা এসে পড়ে, তবে তাদের চরম অবনতি ঘটে দুর্নীতির প্রশ্রয়ে। অতএব, আজ সমগ্র মানবসমাজ যে বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত পরমাণুবোমার প্রচণ্ড শক্তির অত্যাচার হতে আত্মরক্ষার জন্য আর্ত্তনাদ করে উঠেছে এতে অবাক হবার কিছুই নাই। কারণ, শক্তির মুখে লাগাম না থাকলে সে উদ্দাম হয়ে বিপ্লব ঘটায় এবং চতুর্দিকে ধ্বংস করে।

তাই স্বভাবতঃ প্রশ্ন ওঠে বিজ্ঞান কি জগতে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করতে পারে? আপন ধ্বংসশক্তির অপপ্রয়োগ হতে মানুষের সমাজকে উদ্ধার করতে পারে? বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ দেন এ প্রশ্নের এক মামুলী উত্তর। জোর গলায় বলা হয়ঃ—বিজ্ঞান হচ্ছে সত্যের পূজারী, বিজ্ঞানে কোন সংস্কার, আবেগ, অন্ধমতবাদ বা বিশ্বাসের স্থান নেই; মানুষে মানুষে কোন কৃত্রিম ভেদাভেদ, অথবা জাতি, ধর্ম্ম এবং বর্ণের বিশিষ্টতা বিজ্ঞান মানতে রাজী নয়; সুতরাং বিজ্ঞান হচ্ছে সত্যই বিশ্বমানবের ধন বা আন্তর্জাতিক সম্পদ। ইহাই যে বিজ্ঞানের প্রকৃত ও অবিসংবাদী সংজ্ঞা এতে কোন সন্দেহ নাই। তবে একথা ভুললেও চলবেনা যে বিজ্ঞানে জ্ঞানের সীমানা আছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বা যন্ত্রযোগে তাকে বাড়িয়ে নিয়ে বিজ্ঞান করে বহির্জগৎ বা জড়জগতে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ; এর বিশ্লেষণ হতে আরোহমূলক যুক্তি-বিচার দিয়ে বিজ্ঞানীরা গড়ে তুলেন তাঁদের এক একটি সিদ্ধান্ত। এই হল বিজ্ঞানে জ্ঞানাহরণের পদ্ধতি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যে যোগাযোগ বা কাজকারবার তাতে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও নিয়মকানুন

হয় অচল। কেননা মানুষ হচ্ছে মন ও বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জীব হতে এখানেই তার বিশেষত্ব। তাই তার প্রয়োজন ও ধর্ম্ম হচ্ছে দ্বিবিধ—দেহের এবং মনের। একদিকে তাকে সতত তাড়না করছে দেহের বা জীবধর্ম্মের প্রয়োজন, অন্যদিকে চাই তার মনের খোরাক। তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার, আবেগ, স্নেহ, প্রীতি, দয়া, মায়া, দম্ভ, দর্প, অভিমান, খ্যাতির মোহ, অর্থের লোভ, ক্ষমতার স্পৃহা, বিবেক-বুদ্ধি, জানবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি সব কিছু মিলে তার মনকে দেয় অহরহ নাড়াচাড়া। মনের এ ভালমন্দ উভয়বিধ প্রেরণার সঙ্গে দেহের প্রয়োজনের হয় প্রতিক্রিয়া। ফলে, মানুষের মধ্যে দেখা দেয় এক জটিল এবং বিসদৃশ সংমিশ্রণ। জীবধর্ম্মের তাড়নায় তার মন চায় ধন-দৌলত দালান-কুঠী মোটরগাড়ী, মনোরম সাজপোষাক, উপাদেয় পানভোজন, বিলাসবিহার প্রভৃতি যাবতীয় শারীরিক সুখসম্ভোগের সাজসরঞ্জাম। প্রয়োগ বিজ্ঞান জোগায় এদের মালমশলা। বিজ্ঞান-চর্চ্চায় মানুষ হাতে পেয়েছে অফুরন্ত শক্তি এবং সম্পদ। কিন্তু এতে জেগে উঠেছে মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিগতভাবে ঘোরতর বিরোধ এবং প্রতিযোগিতা। পরিণামে এ দ্বন্দ্ববিরোধ দেখা দেয় অশান্তি, বিদ্রোহ এবং যুদ্ধে। দুর্ব্বিসহ দুঃখদৈন্যের অভিজ্ঞতা হতে আজ আমরা বুঝতে পেরেছি বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধে যে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার অভিনয় হয়ে গেল, যার নিদারুণ আঘাতে আহত ও রক্তাক্ত মানবসমাজ এখনো সশঙ্কিত, এ সম্ভব হোত না বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে দুই অপূর্ব্ব যুগ্ম শক্তির; মানুষের নিজের ও তার সমাজের জন্য এরা নির্ম্মাণ করেছে যথাক্রমে ভালো এবং মন্দ।

একথা অস্বীকার করা চলে না যে বিজ্ঞানের প্রয়োগে আমাদের জীবনযাত্রার মান যাচ্ছে উন্নত হয়ে, আমাদের খাদ্যশস্যের উৎপত্তির পরিমাণ উঠছে বেড়ে, রেলজাহাজ ও এরোপ্লেনের সাহায্যে দূরদূরান্তরে যাতায়াত এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও রেডিও-যোগে সাগরপারের সংযোগ গেছে সহজ হয়ে, বিবিধ রোগপ্রতিষেধক আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধির আবিষ্কারে এবং নানাভাবে আমাদের

জীবনযাত্রার সুখসুবিধা ও সম্ভোগের সীমানা পড়ছে ছড়িয়ে। এক কথায়, বিজ্ঞান সমাজের স্বাভাবিক ও মানসিক ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্ত্তন নিয়ে এসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ভেবেও আতঙ্কিত হতে হয় যে মানুষ এবং তার সমাজের অস্তিত্ব অবধি বুঝি আজ বিলোপ হতে চলেছে পরমাণুবোমা, হাইড্রোজেন বোমা, বিষাক্ত গ্যাস ও জীবাণু-বৃষ্টি রূপে নব নব প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং নিদারুণ ভয়াবহ মারণযন্ত্রের আবিষ্কারে।

তাই অনেকের মনে হতে পারে বিজ্ঞানের পক্ষে শান্তিপ্রতিষ্ঠা বা শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা হচ্ছে প্রহেলিকার সামিল। আবার অনেকে আছেন যাঁরা সময়ে অসময়ে বলে বেড়ান যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির উৎকর্ষসাধন হচ্ছে আধুনিক সমাজের সকল দুঃখকষ্টের একমাত্র মহৌষধি। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বললে সাধারণতঃ বোঝায় মনের এমন একটি অবস্থা যাতে সকল প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধ ভাবাবেগ হতে মুক্ত হয়ে সত্যের উপর মানুষের শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা যায় গভীরভাবে বেড়ে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে, বিজ্ঞানের শিক্ষা, প্রচার এবং প্রয়োগ হতে এরূপ মনোবৃত্তির উদ্ভব হবার কখনো কি সম্ভাবনা আছে? ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তির জন্য মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে যে প্রবল প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ববিদ্বেষ দেখা দিয়েছে, বিজ্ঞানচর্চ্চা ও বিজ্ঞান-প্রচারের ফলে তা কি কখনো অপনীত হতে পারে? একক বিজ্ঞান-চর্চ্চা কি কোন কৃপণকে উদার, কোন ক্রূর নিষ্ঠুরকে কি কোমল ও হৃদয়বান, কোন দাম্ভিক যশোলিপ্সুকে বিনয়ী, কিংবা কোন অর্থলোলুপ স্বার্থপর ব্যক্তিকে কি ত্যাগী ও মহৎ করে তুলতে পারে? জানিনা কোন বিজ্ঞানী এরূপ অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক দাবী করতে প্রস্তুত হবেন কিনা? যদি কেউ করেন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁরা এখনো ঠিক বিজ্ঞানের গোড়ামী হতে মুক্ত হতে পারেন নি। এরূপ গোঁড়ামী ধর্ম্মের উন্মাদনারই অনুরূপ।

কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক মনে করি যে বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বা শিল্পবিজ্ঞানের মধ্যে এবং বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্ম্মী বা বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি প্রভেদ আছে। বিজ্ঞানসেবী ও কর্ম্মীদের

মধ্যে নিতান্ত মুষ্টিমেয় অল্প কয়েকজনকেই সত্যিকার বিজ্ঞানী বলা যেতে পারে। এদের সংখ্যা শতকরা একজনও হবে কিনা সন্দেহ। বাকী সবাই জীবিকা অর্জ্জনের উপায় হিসাবে করেন বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখার চর্চ্চা এবং প্রয়োগ। তাঁদের এই একদর্শিতা বা বৈশিষ্ট্য তাঁদের মনকে করে সঙ্কীর্ণ এবং তাঁদের জগতকে করে ক্ষুদ্র। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন শ্রেণীর সাধারণ লোকের সঙ্গে এঁদের কোন প্রভেদ দেখা যায় না। একথা কি কেউ জোর গলায় বলতে পারেন যে বিজ্ঞানকর্ম্মীরা আছেন সমাজে এক বিশিষ্ট বা উচ্চ আসন দখল করে, এবং অন্যান্য দলের সাধারণের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষায়, সত্যনিষ্ঠায়, দয়াদাক্ষিণ্যে, স্বরুচি ও শান্তিপ্রিয়তায় তাঁরা হচ্ছেন অনেক উন্নত ও অগ্রগামী? বিজ্ঞানকর্ম্মীরা নিজেই এর জবাব দিন। অবিজ্ঞানী জনসাধারণের মধ্যে যে সব কুসংস্কার, মূঢ়তা, বুদ্ধির মোহ ও চরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখা যায়, বিজ্ঞানকর্মী ও যন্ত্রবিজ্ঞানীরা যে তা হতে মুক্ত নন এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দম্ভ, দর্প, অভিমান, দুরাকাজ্ক্ষা, ক্ষমতা ও অর্থ এবং খ্যাতির মোহ, জাতীয়তা ও দেশভক্তির উগ্রনেশা, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, ঘৃণা, ভুলভ্রান্তি এবং সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি দোষ বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সমানভাবে দেখা যায়। অর্থের মায়া ও ক্ষমতার মোহে বিজ্ঞানীরাও মজুরের মত খেটে যাচ্ছেন রাষ্ট্রশক্তির শাসনে এবং বিনা দ্বিধায় প্রস্তুত করছেন যুদ্ধের যত মালমশলা ও আসুরিক অস্ত্রশস্ত্র। এঁরা উচ্চরবে আপন দুষ্কর্ম্মের সাফাই করেন দেশরক্ষার দোহাই দিয়ে। আত্মরক্ষার ছদ্মবেশে চলছে এ সব দুষ্কৃতি ও মহাপাপ। এ আত্মরক্ষারই অছিলায় দেশে দেশে যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে অকাতরে। সামরিক বিজ্ঞানে এই আত্মরক্ষারই অঙ্গ হচ্ছে অতর্কিতে আক্রমণ। সকল দেশেই বর্ত্তমানে দেখা দিয়েছে বিজ্ঞানের এক নূতন শাখা যার নাম হয়েছে প্রতিরোধ বিজ্ঞান (Defence Science) এবং এতে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দিচ্ছে বহু বিজ্ঞানকর্ম্মী এবং যন্ত্রী। প্রত্যেক দেশেই তাদের জল স্থল ও বিমান-বাহিনীতে ভর্ত্তি হচ্ছে বিজ্ঞানী এবং অবিজ্ঞানী সমানভাবে, দেশভক্তি ও জাতীয়তার প্রবল নেশায়। এ অস্বীকার করা যায় না যে বিগত দুই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে বিজ্ঞানীরাও অন্যশ্রেণীর

স্বেচ্ছাসেবকদের মত সমান আগ্রহ বা উৎসাহে শত্রুর দেশের বিজ্ঞানী ভাইদের জীবন এবং ঘরবাড়ী ধ্বংস করেছেন মুহুর্মুহু বোমা ফেলে। যুদ্ধের কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করে উৎপীড়ন ও কারাবাস নিয়েছেন বরণ করে, এমন বিজ্ঞানীদের কথা বড় শোনা যায় নি।

বস্তুতঃ বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিজ্ঞানীরা যে সমাজে অন্য কোন শ্রেণীর লোকের চেয়ে মহত্তর বা উচ্চতর জীব এ কথা মানা চলে না। কিন্তু তাঁদের একটি মস্ত স্থবিধা আছে যে তাঁরা যদি দল বেঁধে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও মালমশলা প্রস্তুত করবার সকল প্রকার প্রচেষ্টায় যোগ দিতে নারাজ হন, তবে যুদ্ধের নিবৃত্তি বা শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে সহজ। বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিজ্ঞানীরা কি এতটা মনের জোর দেখাতে বা নৈতিক বল প্রয়োগে সক্ষম হবেন? শুধু বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনের এ দৃঢ়তা বা চরিত্রের এরূপ বল আসতে পারে না। এর জন্য চাই অন্যবিধ শিক্ষা; কারণ, কেবল মাত্র বহির্জগতের পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং হেতুবাদের যুক্তিবিচার মানুষের মনে মহত্তর প্রেরণা বা ধর্ম্মনীতির আবির্ভাব ঘটাতে পারে না। লক্ষ্য যার উর্দ্ধদিকে, সৎপথ অবলম্বনে সংকল্প যার অটল, অদমনীয় বিবেকবুদ্ধিতে যা শক্তিমান, বিশ্বমৈত্রীর সমুজ্জ্বল অনুরাগে যা উদ্ভাসিত, এরূপ কলুষবিহীন উদার মন শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যে গড়ে তোলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

মানুষ ও মানবসমাজের উন্নতিবিধানের দুটি সনাতন পন্থা জানা আছে। এদের একটি হচ্ছে বহির্মুখীন এবং অপরটি অন্তর্মুখীন। প্রথমটির লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের পরিবেশের উন্নয়ন ও সমন্বয়, এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যার পদ্ধতি। বিধি বিধান, আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম কানুন হচ্ছে এর অঙ্গ। সংঘবদ্ধভাবে কলের মত কাজ চালাবার এতে অনেক স্থবিধা আছে। কিন্তু কোন সঙ্কট বা আপদকালে আত্মরক্ষার জন্য যে সংযমশক্তির প্রয়োজন হয়, এতে তার বিকাশ হবার স্থযোগ নেই। অন্তর্মুখীন পদ্ধতিরও একই লক্ষ্য। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ নিয়েই এর কাজ-কারবার। চরিত্রের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা এবং মানবমনের মহত্তর ও উচ্চতর গুণাবলীকে জাগ্রত ও ব্যক্ত করা হচ্ছে এর বিশেষত্ব। সমাজের প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতির জন্য এ দুই পন্থা হচ্ছে

পরস্পরের পরিপূরক এবং সমানভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় সবাই মনে করে এরা পরস্পর বিরোধী এবং বিচ্ছিন্ন। বর্ত্তমান জগতে যত কিছু দুঃখ এবং দুর্দ্দশার মূলে রয়েছে এ উভয় পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

ন্যায় ও নীতির শাসন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র পরিবেশের উন্নতিসাধনে মত্ত হয়ে উঠলে শান্তিপ্রতিষ্ঠার আশা শুধু বিড়ম্বনায় পরিণত হবে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য—মনের অভিব্যক্তি ও মহৎবৃত্তির উন্মেষ—এতে পূরণ হতে পারে না। জমি যতই উর্ব্বর হোক না কেন, তাতে পচনধরা বীজ বুনলে কখনো অঙ্কুর দেখা দেয় না। আবার মরুভূমিতে সুস্থ ও সুপুষ্ট বীজ বপন করলে তাও কখনো চারা হয়ে উঠবে না। সুতরাং চাই পরিবেশের উন্নতির সঙ্গে মানুষের আত্মোন্নতির সমন্বয়। মানুষের ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্ম্মবৃত্তি তার বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সমান তালে অগ্রসর হতে পারে নি; একারণে তার দেহমনের বহু হীনবৃত্তি বা তাড়না গেছে অসংযতভাবে বেড়ে। তাই আজ ব্যক্তিগতভাবে মানুষ হারিয়েছে তার সমতা এবং সংযম, এবং সমাজ হারিয়েছে তার স্থিতি এবং শান্তি। ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণই যে মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও ভিত্তি, পৃথিবীর সবাই আজ এ মতবাদ নিয়েছে মেনে। বিজ্ঞানের অফুরন্ত অবদান রাশি রাশি জমে উঠেছে এ আদর্শের বেদীমূলে। ফলে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, অনবরত বেড়ে চলেছে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব। মানুষের এ দ্রব্যময় যজ্ঞ বা অসংযত স্বার্থান্বেষণ তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত না হলে পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার নাই কোন সম্ভাবনা। বিজ্ঞানের চর্চ্চায় এর কোন প্রতীকার মিলতে পারে না। পরিবেশের উৎকর্ষকে বাদ দিলে, আপন প্রকৃতি ও আত্মার উন্নয়নের জন্য মানুষকে খুঁজতে হবে সাধু, সজ্জন এবং মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত। আপন অভিমানে অন্ধ হয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক সময়ে এ সব ত্যাগী মহাপুরুষদের বিদ্রূপ করেন বাস্তববুদ্ধিহীন অনভিজ্ঞ বলে। কিন্তু কথায় বলে, দেবতার নির্বুদ্ধিতা মানুষের বিজ্ঞতার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয়। সমাজের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সমুন্নতির জন্য বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিজ্ঞানী-

দের চেয়ে সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু বৈরাগীদের প্রয়োজন কোন অংশে কম নয়। কারণ, বিজ্ঞানীরা বা বিজ্ঞানকর্ম্মীরা এ যাবৎ কেবল শান্তি-ভঙ্গেরই সহায়তা করে এসেছেন ; এবং আগে যা বলা হয়েছে তা হতে পরিষ্কার বোঝা যায় পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় তাঁদের কোন প্রয়াস সার্থক হতে পারে না, যদি তার পশ্চাতে না থাকে ধর্ম্মনীতি বা মানবতার প্রেরণা। এ প্রেরণা আসে মহাপুরুষদের জীবনের দৃষ্টান্ত হতে। যুগে যুগে এরূপ দৃষ্টান্তে মানুষের সভ্যতা এবং সমাজ উঠেছে উর্ব্বর হয়ে।

কেবল পরিবেশের সংস্কার করে, বিজ্ঞানের সাহায্যে ক্ষমতা, অর্থ এবং ভোগবিলাস বাড়িয়ে তুলে, বা তথা কথিত আত্মরক্ষার উদ্দেশে রাশি রাশি এটম ও হাইড্রোজেন বোমা সৃষ্টি করে, শান্তির অন্বেষণ হচ্ছে একান্তই অলীক কল্পনা এবং স্বপ্ন। প্রমোদভবনে আরামে বসবাস করবার জন্য আমরা আমাদের জীবন ও সমাজকে একটি নিরাপদ ও সুখসম্ভোগের উপকরণে পরিপূর্ণ দুর্গ করে কখনো তুলতে পারব না। এরূপ যান্ত্রিক বা বাহ্যিক কৌশলের সাহায্যে শান্তিসমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা, এ সমস্যাকে আরো জটিল এবং দুরূহ করে তুলবে ; কারণ এতে মানুষের নিতান্ত অপূরনীয় সম্ভোগবাসনা উদ্দীপিত এবং তার স্বার্থ-বুদ্ধির অভিযোগ আরো উদগ্র হয়ে উঠবে।

সমাজে ন্যায়, সত্য এবং শান্তির চরম প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখতে হলে পরিবেশের উন্নয়নের প্রচেষ্টার চেয়েও হয়ত মানবপ্রকৃতির উৎকর্ষের দিকে মনোযোগ দিতে হবে বেশী। একমাত্র বিজ্ঞানের অনুসরণে এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণকল্পে সহযোগিতা করতে হলে বিজ্ঞানীদেরও সমাজের অন্য সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আপন মনের মহৎ গুণাবলীকে সঞ্জীবিত, বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত, সহানুভূতিশক্তিকে উদ্দীপিত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রবৃত্তিকে পরিপুষ্ট এবং পরিণামে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন ভাবভঙ্গীকে সমুন্নত করে তুলতে হবে। শান্তিপ্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগ সার্থক করতে হলে চাই বিজ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধি ও বোধের শুধু সতর্কতা নয়, চাই সর্ব্বোপরি প্রত্যয়ের ভিত্তিতে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন।

বিজ্ঞান সমাজ ও ধর্ম্ম

সকল দেশে এবং সকল যুগে মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় যে দুটি প্রচেষ্টা, সে হচ্ছে তার বাঁচবার এবং জানবার প্রচেষ্টা। এই বাঁচবার তাড়নায় ও জানবার প্রেরণায় মানুষ গড়ে তুলেছে একদিকে তার বিচিত্র কর্ম এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান, তার কল-কারখানা ও যান-বাহন এবং অন্য দিকে তার জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শন। এ হতেই রূপ নিয়েছে, মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধর্ম্ম। মানুষের বাঁচবার এবং জানবার এই দুই সনাতন প্রবৃত্তি হতে জন্ম নিয়ে বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে দুটো বিভিন্ন ধারায়। একটি হচ্ছে তার ব্যবহারের বা প্রয়োগের ধারা, যাকে আমরা বলি প্রয়োগ-বিজ্ঞান এবং অপরটি হচ্ছে তার জ্ঞানের বা দর্শনের ধারা যাকে বলা হয় তাত্ত্বিক-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই উভয় ধারা, তার দার্শনিক ও ব্যবহারের দিক, ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠরূপে। জ্ঞান ব্যতিরেকে যেমন প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে না, সেরূপ প্রয়োগ হতেই জ্ঞানের পরীক্ষা এবং প্রসার ঘটে ; অপিচ নূতন জ্ঞানের সন্ধান মেলে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, আদি যুগের মানুষ তার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের আকস্মিক আবিষ্কার করেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে। এ-সব তথ্যের কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় পরে গড়ে উঠেছে তাত্ত্বিক-বিজ্ঞান। যেদিন মানুষ প্রথম চকমকি ঘষে আগুন জ্বালবার সন্ধান পেল—সেইদিনই হল প্রয়োগ-বিজ্ঞানের জন্ম-তারিখ। এ আগুনে মাটি পুড়িয়ে মানুষ তৈরি করল তার গৃহস্থালির হাঁড়ি, বাসন, কলসী, বাটি এবং তার বসত-বাটির ইট-পাটকেল। খনিজাত মাটি ও কাঠে আগুন দিয়ে বের করল সে তামা, লোহা এবং তা থেকে গড়ে তুলল তার আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র, ছোরা, বল্লম। মরুভূমির বালিমাটিতে উনুন জ্বেলে সে আবিষ্কার করল কাঁচ তৈয়ারীর পন্থা এবং মাল-মসলা। আরো দেখা যায়, সভ্যতার আদি, এমনকি, মধ্যযুগেও বহু মানুষ ক্ষ্যাপার মত ঘুরে বেড়িয়েছে

পরশপাথরের সন্ধান করে, যার স্পর্শে লোহা যাবে সোনা হয়ে; কঠোর পরিশ্রমসহকারে নানাবিধ অদ্ভুত প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষা করেছে এক সঞ্জীবনী সুধার সৃষ্টিকল্পে। এ-সব যাদুকরদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি; তথাপি তাদের পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানের বহুতর নূতন তথ্য পড়ল ধরা। শুধু তথ্যসংগ্রহে মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন কতক মিটল বটে, কিন্তু তাতে তার মনের কৌতূহল বা জ্ঞানের পিপাসার তৃপ্তি হল না। এ-সব তথ্যের কারণ এবং বহির্জগতের রহস্য জানতে মানুষের মন হল তখন অগ্রসর। চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্ত, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি, বজ্রপাতের কারণ এবং বিধি-ব্যবস্থা জানবার জন্য জেগে উঠল তার জিজ্ঞাসা। ধর্মের বিশ্বাস বা দর্শনের যুক্তিতে এ জিজ্ঞাসার উত্তর বা সমাধান মিলল না। পরীক্ষার সাহায্যে এ-সব বিশ্বাস ও যুক্তিতর্কের সত্যতা নিরূপণে মানুষ দিল মন; এতেই হল বিজ্ঞানের উৎপত্তি। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে যে সিদ্ধান্ত করা যায় এবং উত্তরকালে যা নিত্যনূতন পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ সমর্থিত হয়, তাই হল বিজ্ঞানের সত্য; এবং এ-ভাবে যে জ্ঞানের আহরণ, তাই হল বিজ্ঞানের পন্থা। আপন ইন্দ্রিয়যোগে সহজ, বা উদ্ভাবিত যন্ত্রযোগে তীক্ষ্ণতর ও সূক্ষ্মতর প্রত্যক্ষ, অনুভূতি হল বিজ্ঞানের ভিত্তি। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথ্যসংগ্রহ এবং বিচারবুদ্ধির সহযোগ-সংযোজনার ফলে বিজ্ঞানের এক-একটি সিদ্ধান্ত বা নিয়ম উঠেছে গড়ে। তাই কোন প্রকটিত সত্য, প্রত্যাদেশ, আপ্তবাক্য, সংস্কার, বিশিষ্ট মতবাদ, শাস্ত্রের বা আচার্যের দোহাই, নিছক অনুমান বা কল্পনা বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হতে পারেনি। বৈজ্ঞানিক সত্যের এক-মাত্র মাপকাঠি হচ্ছে পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি। নূতন নূতন পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যায় অনেক সময় বদলে। তাই বিজ্ঞান সর্বদাই গতিশীল, জাতিভেদ বা সাম্প্রদায়িকতা বিজ্ঞানে অচল। এ-কারণে বিজ্ঞানকে বলা হয় আন্তর্জাতিক বা বিশ্বমানবের ধন।

তথাপি বিজ্ঞানে বিশ্বাসের স্থান নেই, একথা বললে ভুল হবে। বিজ্ঞানের মূলে রয়েছে একটি বড় রকমের বিশ্বাস, যার অভাবে বিজ্ঞান হবে অচল। বিজ্ঞানীদের ধ্রুব বিশ্বাস—বিশ্বজগতের পশ্চাতে রয়েছে একটি সনাতন শৃঙ্খলা বা নিয়ম; দেশকালনির্বিশেষে এর অক্ষুণ্ণ প্রতি-

পত্তি, এবং একেই আশ্রয় করে বিশ্বজগৎ আছে টিকে। এ হতেই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের হেতুবাদ বা কার্যকারণ-তত্ত্ব। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম দেশকাল অভেদে সকল অবস্থাতেই অলঙ্ঘ্য এবং অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় কোন পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া যায়, ঐ একই অবস্থায় উক্ত পরীক্ষার পুনঃ প্রয়োগ যে কোন স্থানে বা যে কোন কালেই করা হোক না কেন, ঐ একই ফলের উৎপত্তি হবে। এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে, ভারতবর্ষে গঙ্গানদীর জলে শিলা ফেললে যেমন তা জলের ভিতর ডুবে যায়, ইংলণ্ডে টেমস নদীর জলে বা আমেরিকার মিসিসিপির জলে, অথবা প্রশান্ত বা এটলান্টিক মহাসাগরের জলে, এমনকি, কলকাতার লালদীঘির জলে, বা পাড়াগাঁয়ের পুকুরের জলে, শিলা ফেললেও ঠিক সেইভাবেই যায় ডুবে। পাকা আম্ বৃন্তচ্যুত হলে নীচে মাটির দিকে পড়তে থাকে; এর কোন ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ভবিষ্যতেও যে এভাবে পড়বে, এ সম্বন্ধে কারো কোন সংশয় হয় না। অন্যথা, কাল হতে বা ভবিষ্যতে যদি বৃন্তচ্যুত আম হঠাৎ ঊর্ধ্বগামী হয়ে আকাশপথে ছুটে পালায়, তাহলে ধরাপৃষ্ঠের মানবশিশু যে শুধু অমৃতরসে বঞ্চিত হবে এমন নয়, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঘটবে এক মহাপ্রলয়ের অভিনয়। একেই বিজ্ঞানে বলে মহাকর্ষণ, এ-ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ বা মাটির টান। এ মাটির টান আছে বলেই আমরা ধরাপৃষ্ঠে দাঁড়াতে পারি বা দৌড়াতে পারি, পা তুলে ও পা ফেলে। এ-টানের বিরাম নেই, বা এর কখনো বিরাম হতে পারে না; এ হচ্ছে ধ্রুব সত্য—এ সম্বন্ধে কারো সন্দেহ হয় না। কেননা, তা না হলে পৃথিবীতে জীবজন্তুর বসতি হোত অসম্ভব। সবাই তখন ভেসে বেড়াতো হাওয়ার ভিতর আকাশপথে।

প্রায় তিনশত বছর হতে চলল বিজ্ঞান তার প্রবর্তিত পন্থায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। এর ফলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কৃতি গেছে বহু বদল হয়ে। গত ১৫০ বৎসরব্যাপী প্রয়োগ-বিজ্ঞানে যে-সব অভাবনীয় ও বিস্ময়কর কলকৌশল এবং যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ঘটেছে, তাতে মানুষের

সমাজে এক মহা বিপর্যয় এবং পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই প্রয়োগ-বিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষ আজ রেল, স্টীমার, মোটর চেপে চলে বেড়ায়, অন্ধকারে জ্বালায় বিজলী বাতি, এরোপ্লেনে আকাশে ওড়ে, সিনেমাতে টকি দেখে, টেলিফোনে কথা বলে, রেডিওতে দেশবিদেশের গানবাজনা ও খবর শোনে, এবং টেলিভিসনে করে দেখাশোনা। দেশকালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে মানুষ হয়ে উঠেছে আজ বিজ্ঞানের কৃপায় সর্বজয়ী। গ্রীষ্মের উত্তাপ ও শীতের হিমকে নিয়ন্ত্রিত করবার উপযোগী কৌশল মানুষের আজ করায়ত্ত। গুরুতর ব্যধিপ্রশমক পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিটিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রমুখ বহুবিধ অমোঘ ঔষধির আবিষ্কারে সে দীর্ঘজীবী হবার উপায় জেনে নিয়েছে। কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে আবার ট্যাঙ্ক, রবট বোমা, নেপলাম, এটম বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি অশেষবিধ প্রচণ্ডশক্তিশালী ভয়াবহ মারণযন্ত্রের নির্মাণ করে জগৎজুড়ে সৃষ্টি করেছে এক নিদারুণ বিভীষিকা।

বিজ্ঞানের নিত্য-নূতন আবিষ্কারে মানুষের সভ্যতা এবং সমাজের রূপ হয়েছে অভিনব। আধুনিক সভ্যতাকে তাই বলা হয় বৈজ্ঞানিক সভ্যতা এবং আধুনিক যুগের নাম হয়েছে বৈজ্ঞানিক যুগ। এর ফলে মানুষের জীবনে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তারই কিছু আলোচনা করব এখানে।

প্রথমতঃ আলোচনা করা যাক বিজ্ঞানের দার্শনিক দিকের প্রভাব নিয়ে। যে অটল বিশ্বাসকে আশ্রয় করে বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে এবং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণযোগে যাকে পরম সত্য বলে প্রতিষ্ঠা দান করেছে —তা হচ্ছে বিশ্বজগতে এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম বা শৃঙ্খলার অস্তিত্ব। এ নিয়মে বাঁধা আছে চন্দ্রসূর্য, গ্রহতারা, জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ। এ নিয়ম হচ্ছে তাই শাশ্বত এবং সনাতন। কিন্তু এর ফলে মানুষেয় ধর্মবিশ্বাস গেল শিথিল হয়ে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাদের দেবতা বলে পূজা করা আর চলে না ; এবং ভগবান বা সৃষ্টিকর্তার পূজা-উপাসনা করে ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, মহামারী, অনাবৃষ্টি এবং অজন্মার হাত হতে রক্ষা পাবার উপায় মিলতে পারে না। পুরোহিতের আদেশে বা

শাস্ত্রের শাসনে প্রচলিত আচার এবং সংস্কারের উপর মানুষের শ্রদ্ধা গেল কমে। এ-কারণে মানুষের সমাজে ধর্ম এবং পুরোহিতের শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমশ জেগে উঠল বিদ্রোহ। শাস্ত্রের বিধান অমান্য করে কপার্নিকাস এবং গ্যালিলিও প্রমাণ দিলেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করে আমাদের পৃথিবী ঘুরছে এক নির্দিষ্ট উপবৃত্তের রেখাপথে। এতে ধর্মাচার্যদের বিচারে গ্যালিলিও হলেন অপরাধী এবং অশেষ লাঞ্ছনা হল তার পুরস্কার। কিন্তু পরিণামে শাস্ত্র বা আচার্যের প্রাধান্য এবং প্রভাব গেল কমে। প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের সমাজে বহু কুসংস্কার, বীভৎস আচার এবং প্রথা ছিল প্রচলিত। বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণলব্ধ বিচারবুদ্ধি এ-সব কলুষিত রীতিনীতির অপনয়ন যে সহজ এবং সুগম করে তুলেছিল, এ-কথা অস্বীকার করা চলে না। বিজ্ঞানের প্রমাণে এক সনাতন নিয়মের অধীনে জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান রয়েছে কার্যকারণ-সূত্রে বাঁধা। এতে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব গেল সৃষ্টির মধ্যেই বিলোপ হয়ে। মহাকর্ষশক্তির আবিষ্কার করে পরম বিজ্ঞানী নিউটন এবং তার সমসাময়িক পণ্ডিতগণ তথাপি ভগবানের অস্তিত্ব মেনে নিলেন, প্রাকৃতিক নিয়মের বিধানকর্তা হিসাবে। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জগৎসৃষ্টির কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যের প্রমাণ বা পরিচয় পাওয়া হল দুষ্কর, এবং এ নিয়ে কোন অনুসন্ধান করা হয়ে উঠল অর্থহীন। 'কেন', এই প্রশ্ন ছেড়ে 'কি-ভাবে' যে জগৎটা চলেছে এবং গড়ে উঠেছে, এই হল বিজ্ঞানের জানবার বিষয়। তাই বিজ্ঞান হল জড়বাদী। একেই ভিত্তি করে বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রাসাদ উঠল গড়ে; বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করলেন বহুবিধ কলকারখানা এবং অগণিত যন্ত্রপাতি। বিজ্ঞানের মতে বিশ্বজগৎ হল একটি পাকা কল, কোথাও কোন খুঁত নেই এর নির্মাণ-কৌশলে বা বস্তুসম্পদে : এ বিশ্ব-যন্ত্র চলেছে নিঝর্ঞ্ঝাটে বল ও গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সবাই ঘুরছে অবিরাম তাদের নির্ধারিত পথে এক নির্ধারিত গতিতে। কোন এক সুদূর অতীতে তাদের জন্মতিথিতেই বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এ-পথ এবং গতি। যে-পথে তারা ঘুরপাক খাচ্ছে তা-হতে তাদের আর নিস্তার নেই। কবির কথায় 'অস্তিত্বের চক্রতলে একবার

বাঁধা পড়লে আছে কি নিস্তার।' ফলে বিশ্বজগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 'সূত্রে মণিগণাঃ ইব' এক সনাতন শৃঙ্খলে রয়েছে গাঁথা। একেই বলে বিজ্ঞানের হেতুবাদ বা নৈশ্চিত্যবাদ। এতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের লাগল দ্বন্দ্ব।

সৃষ্টজগতে মানুষের যে-স্থান বিজ্ঞান নির্ণয় করল, তার ফলে এবং ডারউইন-প্রবর্তিত অভিব্যক্তিবাদের প্রচারে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এ দ্বন্দ্ব উঠলো আরো প্রবল হয়ে। ধর্মশাস্ত্রে সৃষ্টিকর্তা ভগবান ছিলেন সকল শক্তির পরম আধার এবং মানুষ ছিল সকল জীবের শ্রেষ্ঠ জীব, ভগবানের অনুরূপ; সাধনাবলে ভগবৎশক্তির অধিকারী হবার মত ছিল তার ক্ষমতা। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে এ-সব ধারণা গেল ভেঙে। বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রমাণ হল, পৃথিবী হচ্ছে নক্ষত্র-জগতে একটি অতি নগণ্য গ্রহবিশেষ, সূর্যকে কেন্দ্র করে অন্যান্য গ্রহের মত এ ঘুরে বেড়াচ্ছে আপন কক্ষে। সূর্যের আয়তন হচ্ছে পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ। পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহাদি এবং সূর্যকে নিয়ে হচ্ছে আমাদের সৌরজগৎ। এই সৌরপরিবারের অনুরূপ আরো প্রায় তিন হাজার কোটি সৌর-পরিবার মিলে যে এক বিশাল নক্ষত্রগোষ্ঠির সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বলে ছায়াপথ। নক্ষত্রজগতে এ ছায়াপথের অনুরূপ আরো তিন কোটি ছায়াপথের নিদর্শন পেয়েছে বিজ্ঞান। এ-হতেই সহজে দেখা যায় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী হচ্ছে মহাসমুদ্রে এক ফোঁটা বারিবিন্দুর সমান। অতএব এ-হেন নগণ্য পৃথিবীগ্রহের বাসিন্দা ক্ষণজীবী মানুষের প্রাধান্য কল্পনা করার মধ্যে না আছে কোন যুক্তিবিচার, না আছে কোন অর্থ। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের প্রচার ফলেও মানুষের প্রাধান্য এবং গুরুত্ব গেল ঘুচে। এ-তত্ত্বের প্রভাবে মানুষের সমাজে আরো একটি পরিবর্তন গেল দেখা। সকল মানুষের সমান অধিকার, এ হচ্ছে আধুনিক রাজনীতির বুলি। ডারউইনের মতে সকল মানুষ যে সমান হতে পারে না এর প্রমাণ আছে জীববিদ্যায়। বংশগত উত্তরাধিকারের ফলে মানুষে মানুষে হয় অনেক প্রভেদ। বাইরের শিক্ষাদীক্ষায় এ-প্রভেদ যায় না পুরাপুরি বিলোপ হয়ে। বিজ্ঞানের

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডারউইনের মতবাদ গেছে অনেক পরিমাণে বদলে। তথাপি তার মৌলিক সিদ্ধান্তে যে কোন গলদ নাই, এ-কথা জীববিদ্যার সকল পণ্ডিতেরাই মেনে নেন। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এ-সব তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্ত এ-ভাবে মানুষের সমাজে করল একপ্রকার নিরীশ্বরবাদের প্রচার, যাতে ধর্মের বহু অনুশাসন এবং বাঁধন গেল শিথিল হয়ে।

অন্য দিকে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের কার্যপ্রণালী আয়ত্ত করে, বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আপন জীবনযাত্রাকে সুগম, সুন্দর, সুখ-সুবিধাবহুল এবং উপভোগ্য করে তোলবার প্রয়াসী হয়ে উঠল। এর ফলে জন্ম নিল প্রয়োগ-বিজ্ঞান তার যন্ত্রপাতি ও কল-কারখানা নিয়ে। প্রয়োগ-বিজ্ঞানের অনুসরণ করে মানুষ আহরণ করল অফুরন্ত শক্তি এবং অপরিমেয় অর্থ। যন্ত্র এবং যক্ষের সেবায় মানুষ দিল মন। জ্ঞানের চেয়ে কর্মের হল প্রাধান্য।

প্রয়োগ-বিজ্ঞানের প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল মধ্যযুগের শেষভাগে বারুদ এবং কম্পাসের আবিষ্কার। বারুদনির্মাণের ফলে মানুষে মানুষে যুদ্ধ-বিগ্রহের রূপ গেল বদলে। মানুষের হাতে এল অভিনব ক্ষমতা, যার প্রভাবে শক্তি হল কেন্দ্রীভূত, এবং রাজ্যশাসন ও রাজ্যবিস্তারের সুবিধা গেল বেড়ে। এতে মানুষের সমাজে যে বহু কল্যাণের সৃষ্টি হল, তা অস্বীকার করা চলে না। মধ্যযুগের লুটতরাজ, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা গেল কমে। দেশে দেশে আইনের শাসন প্রচলিত হল। রাজা এবং শাসক হলেন শক্তিশালী। পরবর্তী যুগে রাজা এবং সম্রাটের স্থান দখল করল বহুবিধ শাসন-পরিষদ, যাদের নাম হয়েছে ধনতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী, সাধারণতন্ত্রী, গণতন্ত্রী, স্বৈরতন্ত্রী : আরো যে কত রকমের তন্ত্রী তার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। এখনকার যুগে এরাই হলেন শাসনকর্তা, এদের হাতেই কেন্দ্রীভূত শক্তি। প্রয়োগ-বিজ্ঞানের অপূর্ব উন্নতির ফলে এ-শক্তি হয়েছে এখন ভয়াবহ এবং অপরিসীম। এ-শক্তির ব্যবহার হচ্ছে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সমানভাবে। এদেরই কারো কারো অস্ত্রাগারে জমে উঠেছে এটম্‌বোমা, হাইড্রোজেন বোমা

ইত্যাদি অশেষবিধ বিপুলশক্তিশালী ভয়াবহ মারণ অস্ত্র। এ-সব কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে চলেছে আবার প্রতিযোগিতা, যার ফলে বিশ্ববাসী আজ সন্ত্রস্ত এবং সশঙ্কিত। এ-সব মারণ-যন্ত্রের মালমসলা তৈয়ারী করছে আজ লক্ষ লক্ষ নরনারী পেটের দায়ে। মানুষের যত বিদ্যাবুদ্ধি, অর্থ এবং পরিশ্রমের প্রয়োগ হচ্ছে পরস্পরের ধ্বংসের কাজে। জীবিকা অর্জনের তাড়নায় এবং রাষ্ট্রশক্তির শাসনভয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকল কর্মীই আজ সামরিক কাজে খেটে যাচ্ছে কলের মত নির্বিচারে। অথচ, অপরদিকে দেশে দেশে জেগে উঠেছে অন্নবস্ত্র এবং আশ্রয়ের অভাবে অগণিত নরনারীর বিক্ষোভ এবং হাহাকার। এ গেল বারুদ হতে আরম্ভ করে এটম্ বোমার আবিষ্কারের সামাজিক লাভালাভের খতিয়ান।

প্রয়োগ বিজ্ঞানের আর একটি আদি কীর্তি হল কম্পাস। এর ফলে ঘটল আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার এবং উত্তমাশা দ্বীপ ঘুরে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ। এ হতে হল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হল ইউরোপের আধিপত্য। ইউরোপের সভ্যতা গেল চারিদিকে ছড়িয়ে। তারই সংস্পর্শে এসে বহু কল্যাণের পথ গেল খুলে; সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দিল বহুতর অকল্যাণ। পরাধীনতার পেষণে এবং অর্থনৈতিক শোষণে এশিয়া এবং আফ্রিকাবাসীর স্বাভাবিক উন্নতির পথ গেল বহুকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে।

এর পরে এল স্টীম-এঞ্জিন বা বাষ্পীয় শকটের যুগ। এতে গড়ে উঠল রেল স্টীমার। চলাচলের সুবিধা এবং বিবিধ যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হল সহজ। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা হতে জাহাজ-বোঝাই মালমসলা চলে গেল ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যদেশে। ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায়ের ভাণ্ডার ভরে উঠল ধনদৌলতে। কিন্তু তার ভাগ পেল না শ্রমিকেরা। বরং স্ত্রী এবং শিশুপুত্র সঙ্গে নিয়ে তারা খাটতে লাগল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কলের চাকা ঘুরতে লাগল দিবারাত্রি অবিরাম। সুতরাং যন্ত্র-শিল্পের প্রথম প্রবর্তন সমাজের সাধারণের পক্ষে যে কল্যাণকর হয়েছিল, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা

চলে না। শ্রমিকসংঘ সংগঠনে ও শ্রমিক আইনের অনুষ্ঠানে পরবর্তী কালে এ-সব শ্রেণীগত অবিচার এবং উৎপীড়ন গেল কমে। কিন্তু এরই জায়গায় দেখা দিল আবার নূতন এক অকল্যাণ—ধনিকে শ্রমিকে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ। যন্ত্রশিল্পের প্রথম প্রবর্তনে আমেরিকার অবস্থা হল আরো খারাপ। সেখানকার শ্রমিকেরা সবাই ছিল ক্রীতদাস। যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে মানব-সভ্যতার যে অসাধারণ ও অভাবনীয় উন্নতি আজ আমরা দেখতে পাই, তার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল বহু অত্যাচার, অবিচার এবং অন্যায়কে আশ্রয় করে বা বহু শ্রমিকের রক্তশোষণ করে।

শিল্পবাণিজ্যের মত কৃষিকার্য্যেও বিজ্ঞানের প্রভাব কৃষকের পক্ষে গোড়ায় কল্যাণকর হয়নি। এতে কৃষির ব্যবস্থাও কেন্দ্রীভূত হয়েছিল জমিদারের অধীনে, এবং কৃষকদের অবস্থাও ছিল ক্রীতদাসের সামিল।

প্রয়োগ-বিজ্ঞানের পরের কীর্তি হচ্ছে বিজলীবাতি ও খনিজ তৈলের ব্যবহার; টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের প্রবর্তন। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত শাসনের—বিশেষ করে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যশাসনের-সুবিধা গেল বেড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ হল সুগম; কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে চলে গেল সকল শক্তির কলকাঠি। আধুনিক যুগে বেতার এবং রেডিওযোগে এ-ব্যবস্থা হয়ে গেছে একেবারে পরিপাটি ও পাকাপাকি। খনিজ তৈল হচ্ছে বর্তমান যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় শক্তির আধার। মাটির অভ্যন্তর হতে উদ্ধার করে একে বিশোধিত করা হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এ-হতে আসে মোটরকার এবং এরোপ্লেনের প্রধান রসদ। যুদ্ধবিগ্রহে এর চাহিদা যাচ্ছে বেড়ে। এরই দরুণ জাতিতে জাতিতে যে প্রতিযোগিতা ও বিরোধ উঠছে প্রবল হয়ে, একথা কারো অজানা নয়।

প্রয়োগ-বিজ্ঞানের একটি প্রধান কীর্তি হচ্ছে এরোপ্লেন। এর প্রভাবে একদিকে যেমন দেশকালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে মিলনের পথ গেছে উন্মুক্ত হয়ে,

অপরদিকে তেমনি প্রত্যেক রাষ্ট্রের কেন্দ্রশক্তি এতে বেড়ে উঠেছে অভাবনীয় রূপে প্রবল হয়ে। আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহে নিরীহ অসামরিক নরনারীর উপর নিষ্ঠুরভাবে গোলাবর্ষন ও ঘরবাড়ী ধ্বংস করবার এ হচ্ছে একটি অতুলনীয় যানবাহন। কিন্তু প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সব চেয়ে সেরা কীর্তি হল এটম এবং হাইড্রোজেন বোমা। যুগ-যুগান্ত ধরে মানুষ তার অক্লান্ত পরিশ্রমে যে সভ্যতা গড়ে তুলছে, তাকে এক নিমিষে ধূলিসাৎ করবার এমন শক্তিশালী ও অমোঘ অস্ত্র আর নাই।

বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আয়ত্ত করে মানুষ প্রভূত ক্ষমতা এবং অর্থের আহরণে অধিকারী হয়েছে। কিন্তু এ অর্থ এবং ক্ষমতা রয়েছে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ধনিকে শ্রমিকে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে দেখা দিয়েছে প্রবল বিরোধ এবং সংঘর্ষ। মানুষের মন গেছে প্রয়োগ-বিজ্ঞানের যন্ত্রের চাপে পিষ্ট হয়ে।

তাই মানুষ আজ যন্ত্রের পূজারী এবং অর্থের ভিখারী। জড়বাদে তার ধর্মবিশ্বাস, নীতির বাঁধন, মনের শান্তি ও ধৈর্য গেছে ছিন্নভিন্ন হয়ে। বিশ্বাসে পাহাড় টলে, এরূপ স্তোকবাক্যে সে আর ভুলতে চায় না। কিন্তু এটম বোমায় যে পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ ও এক মুহূর্তে সমতল হয়ে যায়, এর সত্যতায় কারো সংশয় নাই। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে শক্তি, স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং সম্ভোগ। কিন্তু এতে মানুষের সমাজজীবনে বা তার ব্যক্তিগত জীবনে যে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ঘটেনি বরং বহু অকল্যাণের ও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এ-কথা অস্বীকার করা চলে না। প্রকৃতির শক্তিকে বশীভূত করে মানুষ হয়েছে বিজয়ী; কিন্তু তার আপন পশুবৃত্তির নিকট সে এখন পরাহত। প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সাহায্যে যেরূপ অপূর্বগতিতে যন্ত্র-শিল্পের প্রসার বেড়ে চলেছে, তাতে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক দুরূহ সমস্যা দিয়েছে দেখা।

কেন্দ্রীভূত শক্তি হচ্ছে বর্তমান যান্ত্রিক যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ। এর ফলে দেখা দিয়েছে মানুষের সমাজে বহু গুরুতর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। ব্যষ্টির স্বার্থের সঙ্গে লেগেছে সমষ্টির স্বার্থের সংঘাত, সমষ্টির

সঙ্গে সমষ্টির বিরোধ উঠেছে প্রবল হয়ে। সমষ্টি অর্থে বলতে হয় রাষ্ট্র, সমাজ, সংঘ, সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন আদর্শবাদী রাষ্ট্রনৈতিক দল। এ যান্ত্রিক সভ্যতায় সমষ্টির স্বার্থের নিকট ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য আছে সম্পূর্ণ অবনমিত হয়ে। এতে ব্যক্তির বহু স্বাধীনতা হয়েছে খর্ব; দলের বুলি, দলের যুক্তি এবং দলের চিন্তার মাঝে ডুবে গেছে তার আপন বুদ্ধিবিচার। ফলে, মানুষের চরিত্র এবং নৈতিক জীবনে এসেছে অবসাদ; তার বিবেক হয়েছে বলহীন, সত্যের প্রকাশে নেই তার পৌরুষ; এবং মানুষ হয়েছে যন্ত্রের অঙ্গ-বিশেষ। এক কথায় বলা যায় ব্যক্তি হয়েছে সমষ্টির দাস। পরিণামে মানুষের সমাজে বেড়ে যাচ্ছে বিরোধ, বিদ্বেষ এবং অশান্তি। কারণ ব্যক্তিকে নিয়েই সমষ্টি; ইট জোড়া দিয়েই হয় দালান। পাকা দালান গড়তে হলে চাই পাকা ইটের যোগাড়। ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে সমষ্টির স্বার্থের সমন্বয় না হলে সমাজের অগ্রগতি যাবে অচিরে রুদ্ধ হয়ে।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানে এমন অনেকগুলি আবিষ্কার হয়েছে, যার ফলে বিজ্ঞানের দার্শনিক তত্ত্বে এক বিপর্যয় গেছে ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ছিল জড়বাদী, এবং বিশ্বজগৎ ছিল তখনকার বিজ্ঞানীদের মতে একটি পাকা যন্ত্র এবং বৈচিত্র্যবহুল। যাবতীয় জড়বস্তুর উপাদান ছিল ৯২ সংখ্যক বিভিন্নপ্রকার মৌল পদার্থ। এরা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মী এবং এদের পরমাণু ছিল অচ্ছেদ্য, অভেদ্য এবং অবিনাশী। তাদের পরস্পর রূপান্তর ছিল অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব। তখনকার বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত ছিল, জড় এবং শক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই হল রেডিয়াম ধাতুর আবিষ্কার। যার ফলে প্রমান হল যে পরমাণু অভেদ্য বা অভঙ্গুর নয়। রেডিয়ামের পরমাণু ভেঙ্গে অহরহ সৃষ্টি হচ্ছে অন্যবিধ বহু মৌলপদার্থের পরমাণু। পরীক্ষায় তাই প্রমাণ হল যে, পরমাণু মাত্রই যৌগিক; এবং এদের উপাদান হচ্ছে দুই বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎকণা ইলেকট্রন ও পজিট্রন এবং জড়কণা নিউট্রন। বিভিন্ন মৌল পদার্থের পরমাণু গঠিত হয়েছে এ-সব আদিম কণিকার বিভিন্ন প্রকার সমাবেশে। এর ফলে ৯২ প্রকার বিভিন্ন মৌলের মধ্যে

দেখা দিল এক অখণ্ড ঐক্য এবং তাদের পরস্পর রূপান্তর হল সহজসাধ্য। পুরাকালের কাল্পনিক পরশপাথরের সন্ধান পেল বিজ্ঞানীরা এতকালে। বিজ্ঞান কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হল না। আরো এমন সব অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার হল, যার ফলে জড় এবং শক্তির সকল ভেদাভেদ গেল ঘুচে। এর প্রমাণ মিলল জড়কণিকা হতে শক্তির বা আলোকতরঙ্গের সৃষ্টি করে, এবং শক্তিতরঙ্গ হতে জড় বা বিদ্যুৎ-কণিকার উৎপত্তি করে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বজগতের দুই মূল উপাদান, শক্তিও জড় হয়ে গেছে একই উপাদানের রূপান্তর বিশেষ, যা কখনো তরঙ্গরূপে কখনো বা তরঙ্গের ঘূর্ণিপাক অর্থাৎ জড়কণিকারূপে আমাদের ইন্দ্রিয়ের পথে এসে ধরা দেয়। কেউ যদি প্রশ্ন করেন এ তরঙ্গ কিসের? এর সহজ কোনো উত্তর নেই। বিজ্ঞানীরা এর জবাব দেন শুধু অঙ্কশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নে। ফলে দাঁড়াল, যাকে আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞানে জড়বস্তু বা শক্তি বলে বর্ণনা করি, বিজ্ঞানের মতে তা হচ্ছে শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়ের কারসাজি ও মনের ভ্রান্তি। আমরা যাকে বস্তু বা শক্তি বলে মনে করি, আসলে তারা তা নয়। দৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে তাই মায়াময়; কবির কথায় বলতে হয়,—"যা আছে তা নাই, আর যা নাই তা আছে।" এ কথাই এখন জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানের আবিষ্কারে। বেদান্তের মায়াবাদ আর আধুনিক বিজ্ঞানের মায়াবাদ যায় এখানে মিলে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের হেতুবাদ ও নৈশ্চিত্যবাদের ভিত্তিও গেছে শিথিল হয়। এর একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। রেডিয়াম ধাতুর একটি বিশিষ্ট ধর্ম যে, এর পরমাণু হচ্ছে ভঙ্গুর। এরা আপনা হতেই অনবরত যাচ্ছে ভেঙ্গে। পরীক্ষায় দেখা যায় প্রতি মিনিটে হাজারকরা এক নির্দিষ্ট হারে রেডিয়ামের পরমাণু যায় ভেঙ্গে। ভাঙ্গবার এই নির্দিষ্ট হারের কখনো কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অনুমান করা যাক্, মিনিটে এক কোটি রেডিয়াম পরমাণুর মধ্যে ১০টি করে পরমাণু যাচ্ছে ভেঙ্গে—যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অন্যবিধ পরমাণুর। যদি সকল পরমাণুগুলিকে টিকিট মেরে নম্বর দিয়ে রাখা যায়, তবে ঠিক কোন্ কোন্ নম্বরের পরমাণু কোন নির্দিষ্ট মিনিটে ভাঙ্গবে, তা

কোনো বিজ্ঞানীই পারবেন না বলতে। এ যেন অনেকটা শহরবাসী লোকদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যার হার নির্ণয়ের অনুরূপ। শহরে দুর্ঘটনায় বা রোগের দরুণ বার্ষিক মৃত্যুর হারের একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া চলে। কিন্তু কোন এক নির্দিষ্ট বৎসরে কোন্ কোন্ নির্দিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হবে, এ নির্ণয় করা অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের হেতুবাদ বা কার্যকারণ-সম্বন্ধ আর টেকে না। মোটের উপর বলা যায়, স্থূলভাবে ব্যবহারিক জগৎ চলে যন্ত্রের মতন কার্যকারণসূত্রের বাঁধনে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা অভিপ্রায়। সমষ্টিগতভাবে যা চলে শৃঙ্খলা বা নিয়ম মেনে, ব্যষ্টিগত-ভাবে কোন বাধাবন্ধন যায় না তার দেখা। এই ইচ্ছাশক্তি বা অভিপ্রায় যে কি, এবং কোথায় যে এর উৎস, এর উত্তর নেই বিজ্ঞানে। শুধু বলা যায় যে, এ শক্তির অস্তিত্ব আছে,—'ওঁ তৎসৎ।' আধুনিক বিজ্ঞানের এ অভিনব সিদ্ধান্তে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ যাচ্ছে ঘুচে। তাই বিজ্ঞানকে আর জড়বাদী বলে নিন্দা করা চলে না। ধর্ম বললে বুঝতে হবে আচার বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়, কিংবা সার্বজনীন উৎসবের উন্মত্ততা নয়; ধর্ম হচ্ছে যা মানুষকে ধরে রাখে সত্যে, জ্ঞানে ও অমৃতে।

বিজ্ঞান মানুষের হাতে এনে দিয়েছে দেবতার শক্তি। এ-শক্তি প্রয়োগ করে মানুষ কিন্তু আহরণ করছে অসুরের সম্পদ। মানুষের সমাজে তাই বেড়ে চলেছে দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং হিংসা-বিদ্বেষ। এর ফলে আমরা দেখেছি মানুষের বহু কল্যাণের সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে বহুতর অকল্যাণের। এর প্রতিকার কোথায়? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। আগে বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানের দুটি দিক—একটি হচ্ছে তার দর্শনের দিক, এবং অপরটি হচ্ছে তার ব্যবহারের দিক। মানুষ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞানকে গ্রহণ করেছে ঐকান্তিকভাবে, যাতে তার আসুরিক সম্পদ উঠেছে বেড়ে; কিন্তু এ সম্পদের সদ্ব্যবহার করবার জ্ঞানকে করেছে সে উপেক্ষা এবং বর্জন। এই জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের দার্শনিক জ্ঞান, যা হতে মানুষের অনুভূতি আসে সত্যের, ঐক্যের এবং মৈত্রীর। একে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে সাত্ত্বিক জ্ঞান,—

"সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥"

সকল ভূতে বিভক্ত হয়েও যা অব্যয় এবং অখণ্ড, তারই জ্ঞান হচ্ছে সাত্ত্বিক জ্ঞান। বহুর মধ্যে যে একের জ্ঞান, ইহাই হচ্ছে সকল সত্যের চরম সত্য। এরই সন্ধান এবং প্রমাণ দিচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞানেব ব্যবহারিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ যে অপরিসীম ক্ষমতা এবং অর্থ অর্জন করেছে, তাতেই মানুষের সাত্ত্বিক বা ঐক্যের জ্ঞান আছে আবৃত হয়ে। তাই প্রয়োগ-বিজ্ঞানের একটি প্রধান কীর্তি রেডিও হতে আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি সত্যের চেয়ে মিথ্যার প্রচার করছে বেশী। যেখানে বিজ্ঞান দিচ্ছে বিশ্বব্যাপী ঐক্যের সন্ধান, সেখানে বিজ্ঞানেরই মালমসলা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করছে অনৈক্যের। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞানকে তার দার্শনিক বা তাত্ত্বিক জ্ঞান হতে বিচ্ছিন্ন করে গ্রহণ করবার হচ্ছে এই পরিণাম। এতে মানুষের কর্ম হয়েছে বিপথগামী। সাত্ত্বিক জ্ঞানের হোমাগ্নিতে দগ্ধ হলেই এ কর্মের হবে শোধন। এতেই হবে মানুষের সকল কর্মের সার্থকতা এবং পরিসমাপ্তি। গীতায় তাই বলেছে :—

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥"

বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড প্রয়োগ-বিজ্ঞান আছে দ্রব্যময় যজ্ঞ নিয়ে; এতে মানুষ খুঁজছে শুধু আপন আপন স্বার্থসিদ্ধি। বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড সাত্ত্বিক বিজ্ঞান আছে জ্ঞানের তপস্যায়—সমস্ত মানুষের মুক্তির আয়োজন সেইখানে।

"জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেনাধিগচ্ছতি।"

মানুষের সহজাত স্বার্থবুদ্ধি হচ্ছে এ জ্ঞানের নিত্যশত্রু। এরই খোরাক যোগায় প্রয়োগ-বিজ্ঞান। এই স্বার্থবুদ্ধিকে প্রশমিত করে তার ধর্মবুদ্ধি বা সাত্ত্বিক জ্ঞানকে উদ্‌বোধিত করতে না পারলে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নেই। এর জন্য চাই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সহযোগিতা। আধুনিক বিজ্ঞান এই পথেই অগ্রসর হয়েছে।

বিজ্ঞানের এই ঐক্যের বাণী পৃথিবীর মোহাচ্ছন্ন নরনারীকে মৈত্রীর প্রেরণায় উদ্বোধিত করে তুলুক। তখন সকলের সঙ্গে যোগে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষ হবে যোগীপদের অধিকারী। এতেই হবে নূতন সভ্যতার অভিব্যক্তি। ভগবদ্‌গীতায় এরই আভাস দিয়েছে যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন যোগী হবার জন্য :—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী
জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী
তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥"

রত্নসাগর গ্রন্থমালার গ্রন্থাবলী

১। কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲
*২। বাঘ ও অজন্তা—দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ১৷৷০
*৩। ইরানের শিল্প ও সংস্কৃতি—গুরুদাস সরকার ৩৲
৪। রবীন্দ্রকথা—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৲
*৫। বাংলার লোকশিল্প—রবীন্দ্র মজুমদার ১।০
৬। বাংলা সাহিত্য পরিচয়—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৷৷০
৭। ব্যঞ্জনা ও কাব্য (১ম)—হরিহর মিশ্র ২৲
*৮। রঙ ও রূপ—ডাঃ সচ্চিদানন্দ কুমার ২৲
৯। ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা—প্রিয়তোষ মৈত্রেয় ৩৲
*১০। য়ুরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি—অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲
১১। ব্যঞ্জনা ও কাব্য (২য়)—হরিহর মিশ্র ২৲
*১২। রূপকার নন্দলাল—শান্তিদেব ঘোষ ২৷৷০
*১৩। আমার কথা—কথক : ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ অনুলেখক : শুভময় ঘোষ ১৷৷০
১৪। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি—প্রিয়দারঞ্জন রায় ২৲

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে :...

*১৫। গ্রহে উপগ্রহে—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
*১৬। সংখ্যা বিজ্ঞানের অ আ ক খ—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

---

* চিহ্নিত বইগুলি সচিত্র

৬, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রত্নসাগর গ্রন্থমালা